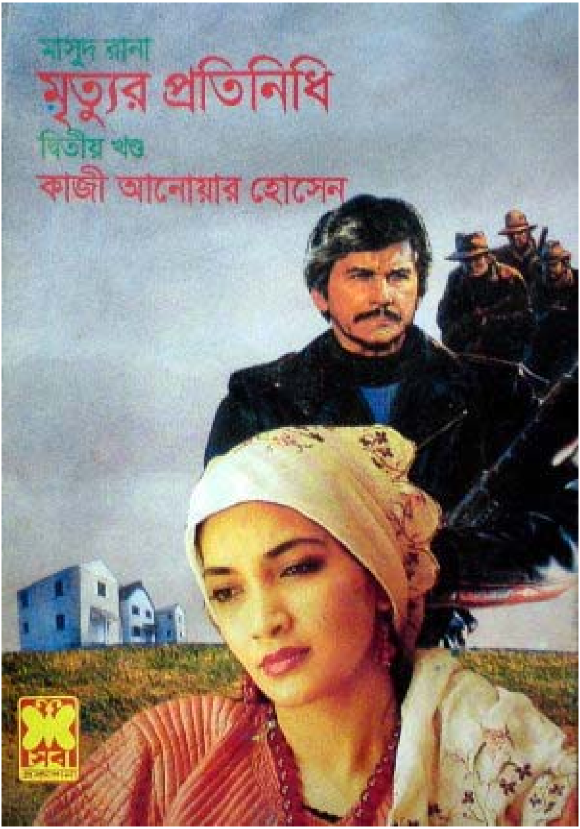

মাসুদ রানা
মৃত্যুর প্রতিনিধি
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা

মৃত্যুর প্রতিনিধি-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

‘ইয়েস, লেডি?’ নাদিরাকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সাইনবোর্ড পড়তে দেখে এগিয়ে এল মোটাসোটা, বৃদ্ধ দোকানি। দোকানটা ক্যাথিড্রাল রোডে। সাইনবোর্ডের নিচের দিকে লেখাগু উই বাই অ্যাণ্ড সেল ডায়মণ্ড, গোল্ড অ্যাণ্ড সিলভার।

ভেতরে চলে এল ও। রিং ফিঙ্গারে পরা আংটিটা দেখাল বৃদ্ধকে। ‘এটা বিক্রি করতে চাই।’

ওর হাতটা ধরল দোকানি। ‘বিয়ের আংটি, তাই না?’ নাদিরাকে মাথা দোলাতে দেখে সে-ও মাথা দোলাল সমঝদারের মত। ঝুঁকে দেখতে লাগল জিনিসটা। ‘ভালমত দেখা দরকার।’

‘শিওর, দেখুন না।’

আস্তে করে আংটিটা খুলে নিল বৃদ্ধ। ‘এত লুজ কেন?’

‘ওহ্, সম্প্রতি বেশ ওজন হারিয়েছি আমি।’

মাথা দোলাল লোকটা। ‘আচ্ছা! তা অবশ্য এমন কিছু নয়। যখন তখন ঘটতে পারে।’

দোকানের ব্যাক রূম থেকে বেরিয়ে এল বুড়োর ডবল সাইজের এক বুড়ি। প্রথমে আগ্রহ নিয়ে নাদিরাকে দেখল সে। তারপর স্বামীর হাতে চমৎকার একটা আংটি দেখেই ওর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। ‘কি, দেখি!’ স্বামীর ঘাড়ে প্রায় চড়াও হওয়ার জোগাড় করল বুড়ি।

‘দাঁড়াও। আগে আমাকে দেখতে দাও,’ পিছিয়ে গিয়ে নিজের ওয়ার্কিং ডেস্কে বসল বৃদ্ধ। টেবিল ল্যাম্প জ্বালল। তারপর চোখে লুপ এঁটে ঝুঁকে পড়ল আংটিটার ওপর। ‘কেন বেচতে চাও এ আংটি?’ একই ভাবে ঝুঁকে আছে সে।

‘স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমি চাই না ওর কোন স্মৃতি সঙ্গে রাখতে।’

‘কেন ছাড়াছাড়ি হলো?’ প্রশ্ন করল বুড়ি। ‘লোকটা ভাল ছিল না?’

মাথা দোলাল নাদিরা। ‘ও একটা জানোয়ার!’

চোখ কোঁচকাল মহিলা। ‘মারধোর করত নাকি তোমাকে?’

ভাল মেয়ের মত মাথা দোলাল ও। ‘করত।’

‘শুনলে?’ স্বামীর দিকে ফিরল বৃদ্ধা। ‘হতচ্ছাড়া মারধোর করত একে।’

‘শুনলাম।’ আংটি উল্টেপাল্টে দেখল দোকানি। ‘হরহামেশা ঘটছে এরকম।’

‘এইসব স্বামীদের ধরে ধরে...’

‘আহ্! থামো, কথা বলতে দাও। তা, এটার দাম কত হলে চলবে, ইয়াং লেডি?’

‘পাঁচ হাজার।’

চোখ কপালে তুলল বৃদ্ধ। ‘পাঁচ হাজার, লেডি!’

‘আমার স্বামী...মানে, প্রাক্তন স্বামী বলেছিল, পাঁচ হাজার দিয়েই ওটা কিনেছে সে বছর দেড়েক আগে।’

বড়সড় মাথাটা ডানে-বাঁয়ে দোলাল বৃদ্ধ। ‘আস্ত একটা মিথ্যুক তোমার স্বামী, দুঃখিত, প্রাক্তন স্বামী। এক হাজারের এক ডলার বেশিও দাম হতে পারে না এই আংটির। সে যাক, আমি পাঁচশো পর্যন্ত দিতে পারব।’

‘মাত্র? থাকগে, ফেরত দিন আমার আংটি। দেখি অন্যখানে... ।’

‘দাঁড়াও দাঁড়াও, রাগ কোরো না। এই আংটির বর্তমান বাজারদর হতে পারে এক হাজার। রিটেইল। কিন্তু অত টাকা দেয়ার উপায় নেই আমার। তোমার জন্যে সাড়ে সাতশো পর্যন্ত উঠতে পারি আমি, অ্যাট বেস্ট।’

নাদিরা বুঝল, বুড়োর পছন্দ হয়েছে আংটি, সহজে ছাড়তে চাইবে না। কাজেই ঝোলাঝুলি আরম্ভ করল। ও ধীরগতিতে নামতে লাগল, আর বুড়োর দর চড়তে লাগল। অবশেষে এক ঘণ্টা পর ষোলোশো পঞ্চাশে পাকা হলো দাম।

‘ক্যাশ দিতে হবে।’

হাসি মুছে গেল বৃদ্ধের। ‘ক্যাশ? লেডি! দেখে কি মনে হয় এরকম একটা দোকানে এত ক্যাশ মজুত থাকতে পারে? চেক দেব আমি, তবে চিন্তার কারণ নেই, আমার চেক ক্যাশের মতই দারুণ। কাল সকালে প্লেস করা মাত্র...’

‘কিন্তু আজ রাতেই মায়ামি চলে যাচ্ছি আমি। হাতে সময় নেই। তাই ক্যাশ চাই আমার।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায়ত্ব প্রকাশ করল দোকানি। ‘সরি, লেডি। অত ক্যাশ নেই আমার কাছে।’

‘তাহলে কত আছে?’ বলেই বুঝল নাদিরা কাজটা বোকার মত হয়ে গেল। কিন্তু কি আর করা!

‘কুড়িয়ে কাচিয়ে বড়জোর দেড় হাজার হতে পারে।’

তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো নাদিরাকে। বুড়ো-বুড়ি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল ওকে। বারবার আশীর্বাদ জানাতে লাগল যেন ওর মায়ামির নতুন জীবন আনন্দময় হয়।

প্রথম দোকানের মত সহজে কাজ আদায় করা গেল না আর

কোথাও। দুটো দোকান প্রায় অভদ্রের মত হাঁকিয়ে দিল ওকে, কারণ তাদের কোনরকম পারচেজ ডকুমেন্ট দেখাতে পারেনি নাদিরা। কয়েকটা দোকান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এমন দাম বলল, ভাবখানা, হয় দাও, নয় বিদেয় হও গোছের। তাই সই, বিক্রি করে ভার কমাতে থাকল নাদিরা।

একটা দোকানে ঘটল অন্যরকম ঘটনা। মালিক লোকটা অল্পবয়সী, টাক মাথা। মুখে পচা দুর্গন্ধ। বাঁ চোখে কালো পট্টি বাঁধা। একটা ভিক্টোরিয়ান ওয়েডিং রিং কিনল সে কোনরকম দরদাম না করেই, নাদিরার হাঁকা দরে।

'আর কিছু আছে নাকি বিক্রি করার মত, ম্যাম? নিয়ে আসুন না! দাম নিয়ে ভাববেন না, যা চাইবেন তাই দেব।'

'ধন্যবাদ। ভেবে দেখব।'

'আপনি আবার আসবেন আশা করতে পারি?' আগ্রহে চকচক করে উঠল তার একমাত্র চোখটা।

'দেখি।'

ঘুরতে ঘুরতে পা ব্যথা হয়ে গেল নাদিরার। সাড়ে চারটের মধ্যে সাতটা রিং বিক্রি করে ফেলল ও। কাঁধের ব্যাগে জমা পড়েছে সাত হাজার ডলার। সাড়ে চারটের দিকে ফেরার তাগিদ অনুভব করল সে। ট্যাক্সি নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল দেরি না করে।

ফোর্ডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাসুদ রানা, মুখে চওড়া হাসি। 'কেমন করলে ব্যবসা?'

'অনেক,' শ্রান্ত মুখে আলো ফুটল মেয়েটির। 'সাতের বেশি।'

'মাই গড!' তাজ্জব হয়ে গেল রানা। 'বলো কি! অবশ্য জানতাম ভাল করবে তুমি, কিন্তু তাই বলে এত হবে ভাবিনি। আমি পেয়েছি মাত্র সাড়ে চার। ভেবেছিলাম আমিই বুঝি সবচে'

বেশি পেয়েছি।'

'তোমারগুলোর চেয়ে বেশি দামী ছিল আমারগুলো।'

গায়ের ওপর ব্রেক কষার আওয়াজে ঘুরে তাকাল ওরা। রানার হাত উঠে গিয়েছিল হোলস্টারের দিকে। থেমে গেল ওটা মাঝপথে। একটা ট্যাক্সি। পিছন থেকে নামল বিল্লাহ ও ফয়েজ। খুশিতে আটখানা। 'ওরাও বোধহয় হারিয়ে দিল আমাকে,' মুখ কালো করে বলল মাসুদ রানা।

দেখা গেল ওর ধারণাই সত্যি হয়েছে। দু'জনে মিলে সাড়ে আট হাজার কামাই করেছে ওরা। অল্প কথায় যার যার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল ওরা, কিছু সন্দেহ করেছে কি না কেউ, তেমন কোন আভাস কেউ দিয়েছে কি না। সবার বক্তব্য শুনে নিশ্চিত হলো রানা, না, তেমন চিন্তার কোন কারণ নেই। দুই একজন খদ্দের যে ওরা আবার আসবে কি না, বা বিক্রি করার মত আর কিছু আছে কি না জানতে চেয়েছে, তা নেহায়েৎ ব্যবসায়িক কারণেই। ওর পিছনে কোনরকম দুরভিসন্ধি আছে বলে মনে হয় না। এ ধরনের ডিলে লাভ হয় আশাতীত, সেটা বুঝেই খোঁজ-খবর করেছে তারা।

'তার মানে বিশ হাজারের মালিক এখন আমরা,' সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল মাসুদ রানা। 'তারও বেশি। গুড। রীতিমত বড়লোক বলা চলে আমাদের। চলো সবাই, হোটেলে ফিরে মানুষ হওয়া যাক আগে, তারপর শানদার খানাপিনা হবে আজ। খানিক বিশ্রাম নিয়ে রওনা হতে হবে আবার।'

গোসল করল ওরা, শেভ করল। নাদিরাও গোসল করল। তারপর সবাই মিলে তৈরি হয়ে নিল ডিনারে বেরুবার জন্যে। আটটা বেজে গেছে ততক্ষণে। বেরুতে গিয়েও কি মনে করে থেমে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

‘এক মিনিট ।’

‘কি হলো?’ প্রশ্ন করল নাদিরা ।

‘ফিরে এসে যখন রওনা হতেই হবে, মালপত্র প্যাকিঙের কাজ এখনই কেন সেরে রেখে যাই না? পরে ভরপেটে কষ্ট করতে হবে না ।’

‘গুড আইডিয়া,’ বলল বিল্লাহ । ‘সেই ভাল । খেয়ে উঠে কাজ করতে একদম ভাল লাগে না আমার ।’

‘রাখো ।’ আবার কি যেন চিন্তা করল রানা ।

‘আবার কি?’ কপাল কোঁচকাল মেয়েটি ।

‘আমরা যদি এখনই চেক আউট করি, অসুবিধে কি? মালপত্র সব গাড়িতে থাকবে । খেয়েদেয়ে ওই পথে রওনা হয়ে যাব আমরা । কি বলো তোমরা?’

‘হ্যাঁ, মন্দ হয় না,’ সায় দিল নাদিরা । ‘সেই ভাল ।’

অতএব যার যার কাপড়-চোপড়, অন্য আর সব গোছগাছের কাজে লেগে পড়ল ওরা । ঠেসে ঠুসে ঢোকানো হলো সব গাড়ির ট্রাঙ্কে । নাদিরার ব্রিফকেস আগের মত রানার হাতেই থাকল । বিছানাপত্রের ক্যারিঅল স্থান পেল পিছনের সীটে, ফয়েজ আর মুত্তাকিমের সঙ্গে ।

রিসেপশন ডেস্কে এসে সবাই ভিড় করল ওরা । দুই রূমের চাবি এগিয়ে দিল রানা । ‘আমরা চেক আউট করছি ।’

‘এত তাড়াতাড়ি?’

‘হ্যাঁ, জরুরী কাজ পড়েছে ।’

‘আবার আসবেন আশা করি?’

‘নিশ্চই! আপনাদের আতিথেয়তার তুলনা হয় না ।’

‘ধন্যবাদ, স্যার ।’

‘এখানে ভাল ডিনার আশা করা যায়, এমন এক রেস্টুরেন্টের

নাম বলুন দেখি!'

'কি খেতে চান, স্যার?'

'স্টেক, বীফ রোস্ট, এইসব আর কি।'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলল লোকটা, 'আঙ্কেল টম'স ট্যাভার্ন। এসবের জন্যে সেরা হোটেল এখানে। হাইওয়ে ধরে সোজা গিয়ে বাঁয়ে টার্ন নেবেন, তারপর সোজা দুই মাইল গেলে পড়বে ওটা। হাতের ডানে।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'বাইরে থেকে দেখে হয়তো পছন্দ হবে না রেস্টুরেন্টটা, কিন্তু রান্না ওদের সত্যিই চমৎকার।'

লোকটাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। এবার ড্রাইভ করছে মাসুদ রানা। যা বলেছিল রিসেপশনিস্ট, ঠিক তাই। নামের মত চেহারাটাও সেকেলে আঙ্কেল টম'স ট্যাভার্নের, কিন্তু রান্না অতুলনীয়। সামনে বিশাল কার পার্ক, গাড়িতে বোঝাই।

ভেতরের দেয়াল ও সিলিঙের চলটা প্রায় সবটুকুই ঝরে গেছে, কিন্তু সেজন্যে দেখতে তত খারাপ লাগে না। সুন্দর সাদা রং করা। দুই মাথায় বড় দুটো ফায়ার প্লেস, ভেতরে জ্বলছে গ্যাস লগ। টেবিল চেয়ার পুরানো হলেও চমৎকার দেখতে। ওক কাঠের তৈরি সমস্ত ফার্নিচার। ঝকঝকে পালিশ করা।

এক মাথায় মেহগনির দীর্ঘ বার, তার পিছনে লাল ভিনাইল দিয়ে চার কিনারা মোড়া বিশাল আয়না। বারটেণ্ডার আর ওয়েট্রেসরা প্রত্যেকে স্মার্ট। মেন্যু দেখে ধুমসে অর্ডার দিল ওরা, খেলো গলা পর্যন্ত ঠেসে। গল্প আর হাসাহাসি চলল সমান তালে। ওরই ফাঁকে চারদিকে সতর্ক নজর রাখল প্রত্যেকে। সবাই মনে রেখেছে এখানে পিকনিক করতে আসেনি ওরা।

সাড়ে এগারোটার দিকে আসন ছাড়ল নাদিরা। 'এক্সকিউজ মি। লেডিজ রুমে যাচ্ছি আমি।'

এক ওয়েট্রেসকে জায়গাটা কোনদিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল সে। বাথরুম ছেড়ে বেরিয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেক আপ ঠিক করতে লাগল। এই সময় ব্যাপারটা নজরে পড়ল তার। আয়নায় পিছনের রেস্টুরেন্ট পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। অজস্র খদ্দের। তার ভেতর চেনা একটা মুখ চোখে পড়ল। তাকিয়ে থাকল নাদিরা।

পরক্ষণেই সচকিত হলো। ও যখন লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে, লোকটাও মুখ তুললে দেখতে পাবে ওকে, হয়তো দেখে ফেলেছে এরই মধ্যে। তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিল নাদিরা। অস্বস্তি লাগছে। ওই লোক এখানে কেন? ভেতরে তাড়া থাকলেও ভাব ভঙ্গিতে প্রকাশ করল না সে। ধীরপায়ে নিজেদের টেবিলের দিকে ফিরে চলল। দূর থেকে ওর চেহারা দেখে কিছু একটা অনুমান করে নিল মাসুদ রানা, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না।

নিজের আসনে বসল নাদিরা। ন্যাপকিন তুলল। তারপর মুখ নিচু রেখে ঠোঁট যথাসম্ভব না নাড়িয়ে বলল, 'রানা! বোধহয় ঝামেলা।'

'মানে?' বলেই হাসল রানা। চেয়ার টেনে নাদিরার আরও কাছে এসে একটা হাত তুলে দিল তার কাঁধে। 'ঠিক আছে,' বলল ও। মুখে হাসি। 'যদি ঝামেলা হয়েই থাকে, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করো, আর খুলে বলো কি হয়েছে।'

'সবশেষে যে জুয়েলারি দোকানে গিয়েছিলাম আমি, ওটার মালিককে দেখতে পেয়েছি আমি এখানে। ড্রিঙ্ক করছে।'

'তাই?' মুহূর্তে হাজার মাইল গতিতে কাজ শুরু করে দিল

রানার মাথা। হাসিমুখে বিল্লাহ ও ফয়েজের উদ্দেশে বলল ও, 'তোমরা কাজ চলিয়ে যাও। হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করো। মুখ তুলবে না। আমাদের দিকে তাকাবে না। নাদিরা, বলো এবার। লোকটা কি রকম দেখতে?'

'টাক মাথা। বাঁ চোখে কালো পট্টি। ওপাশে করিডরে যাওয়ার পথের পাশের টেবিলটায় বসেছে।'

বারের পিছনের আয়নায় চোখ রাখল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ, দেখেছি। তুমি শিওর এ সেই লোক?'

'ড্যাম শিওর।'

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়ল সিলিঙের দিকে। তারপর, যেন ধোঁয়া গেছে চোখে, মুখ ঘুরিয়ে চোখ কচলাতে লাগল। এই ফাঁকে আরও ভাল করে তাকাল লোকটার দিকে। 'হুঁম!'

'এই লোকটা কোনরকম দামাদামি করেনি। যা চেয়েছি তাই দিয়ে দিয়েছে। জানতে চেয়েছে বেচার মত আরও কিছু আছে কি না। বলেছি আমি তোমাকে।'

'হ্যাঁ, বলেছ।' চিন্তা করতে লাগল রানা।

ওদিকে মুত্তাকিম আর ফয়েজ নিজেদের গল্পে মশগুল। কফি পান করছে, সিগারেট ফুঁকছে। তবে কান এদিকে রয়েছে, সব শুনছে ওদের আলাপ।

হঠাৎ কথা বলে উঠল বিল্লাহ। ঠোঁট না নাড়িয়ে ফয়েজের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'ব্যাপারটা কো-ইন্সিডেন্সও হতে পারে। হয়তো কোন ডেট আছে লোকটার, তাই এসেছে। অথবা হয়তো ডিনার করতেই এসেছে। আফটার অল, আঙ্কেল টম'স ট্যাভার্নের নাম ডাক খুব।'

'হ্যাঁ,' ঘেউ করে উঠল ফয়েজ। 'ফিলাডেলফিয়া থেকে

এতপথ ঠেঙিয়ে কামডেন এসেছে ডিনার করতে! তোমার কল্পনার রেলগাড়ি থামাও, বিল্লাহ।'

'বলছ?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'থামো তোমরা,' বলল রানা। 'নাদিরা, মনে করার চেষ্টা করো, ওর দোকান থেকে বেরিয়ে কি করেছিলে তুমি।'

একটু চিন্তা করল মেয়েটি। 'ওখান থেকে বেরিয়ে আরও কয়েক দোকানে গিয়েছি। এটা-ওটা বিক্রি করেছি।'

'দোকানে লোকটা একা ছিল?'

'হ্যাঁ। একা ছিল।'

'ব্যাক রুমেও কেউ ছিল না?'

'ব্যাক রুমে?' থতমত খাওয়া চেহারা হলো মেয়েটির। 'না, মানে, ব্যাক রুমের দিকে খেয়ালই ছিল না আমার। সরি।'

'বুঝলাম,' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। 'ও ব্যাটা নিশ্চই কিছু টের পেয়েছে। যে কারণে তুমি ওর দোকান ত্যাগ করার পর ও পিছু নিয়েছে তোমার। প্রথমে শপিং সেন্টার, পরে আমাদের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছেছে। এবং সেখান থেকে এই পর্যন্ত। হতে পারে,' মাথা দোলাতে লাগল রানা। 'হতে পারে।'

'আমি খুবই দুঃখিত, রানা,' অপরাধীর চেহারা করে বলল নাদিরা।

'এতে তোমার কোন দোষ নেই, নাদিরা। দোষ-ভুল যা হয়েছে, সবকিছুর জন্যে আমি দায়ী। আমার উচিত ছিল তোমাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া।' কিছুক্ষণ ভাবল মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে, শোনো সবাই। আমি বেয়ারা ডেকে বিল দিতে বলছি এখন। বিল পে করে উঠে যাব আমরা। আস্তে ধীরে গল্প করতে করতে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের, খেয়াল রেখো। হুড়োহুড়ি

নয়। যেন দুনিয়ার কোনদিকে খেয়াল নেই, ড্যাম কেয়ার।

'বাইরে গিয়ে আমি, নাদিরা এবং ফয়েজ গাড়িতে উঠব। বিল্লাহ, তুমি বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। পার্কিং লটের কোথাও গিয়ে ঠাঁই গাড়বে। সেখান থেকে রেস্টুরেন্টের প্রবেশ পথ যেন দেখা যায়। যদি দেখো লোকটা আমাদের পিছু নেয়নি, তাহলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা নেহাৎ দৈব-সংযোগ। সেক্ষেত্রে কোন কথা নেই।

'কিন্তু যদি দেখো যে পিছু লেগেছে ব্যাটা, অনুসরণ করতে যাচ্ছে আমাদের। তাহলে বুঝতেই পারছ,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তবে অন্য কিছু নয়, কেবল অজ্ঞান করবে তুমি লোকটাকে, ঠিক আছে?'

মাথা দোলাল মুত্তাকিম বিল্লাহ, 'জ্বি।'

'কাজটা হতে হবে অন্যরকম। ওর ঘড়ি, ওয়ালেট, ক্রেডিট কার্ড সব নিয়ে নেবে। যদি সম্ভব হয়, অজ্ঞান দেহটা ওর নিজ গাড়ির ড্রাইভিং সীটে তুলে দিয়ো। লোকে ভাববে গলা পর্যন্ত গিলেছে। ওকে?'

'ওকে, বস্।'

তুড়ি বাজাল রানা ওয়েটারের উদ্দেশে। নিচু কণ্ঠে বলল, 'আমরা কিছুদূর গিয়ে অপেক্ষা করব। এখানকার পরিস্থিতি যাই হোক, ঠিক পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসব আমরা তোমাকে তুলে নিতে। সবাই স্বাভাবিকভাবে এগোবে গেটের দিকে, ভুলেও লোকটার দিকে তাকাবে না কেউ। লেট'স গো।'

বিল মেটাল রানা নগদে। আশাতীত বকশিশ দিল বেয়ারাকে। তারপর একযোগে আসন ছাড়ল সবাই। হাসতে হাসতে, গল্প করতে করতে এগোল গেটের দিকে। দুনিয়াদারি সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন। পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে তৎপর হলো ওরা। হঠাৎ করেই যেন পারিপার্শ্বিকতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে পড়েছে।

মাসুদ রানা, নাদিরা ও ফয়েজ দ্রুত পা চালাল গাড়ির দিকে। দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা, নাদিরা বসল তার পাশে। ফয়েজ পিছনে। স্টার্ট দিল রানা, টায়ারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে লট থেকে পিছিয়ে এল, তারপর ঘুরেই ছুটল বড় রাস্তার দিকে। বিল্লাহ ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে। পার্কিং লটেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে সে, কিন্তু কোথায়, দেখতে পায়নি ওরা কেউ।

'বাজে কয়টা?' গাড়ি থার্ড গীয়ারে তুলে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বারোটা বাজতে সতেরো মিনিট বাকি,' হাত তুলে রাস্তার আলোয় ঘড়ি দেখে বলল ফয়েজ। কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা।

'চোখ রাখো ঘড়িতে। ঠিক তিন মিনিট পর জানাবে আমাকে।

ধীরগতিতে কামডেনের দিকে এগোল মাসুদ রানা। হাত চোখের সামনে তুলে ধরে বসে আছে ফয়েজ, চোখ কুঁচকে আছে গভীর অভিনিবেশের ফলে। এক সময় হাত নামাল সে। 'পোনে বারো।'

গাড়ি রাস্তার ডান পাশে নিয়ে এল মাসুদ রানা, গতি কমিয়ে পিছনের গাড়িগুলোকে ওকে ওভারটেক করার সুযোগ করে দিল। তারপর অ্যাক্সিলারেটর ঠেসে ধরে হুইল ঘোরাল বন্ বন্ করে। একই গতিতে ফিরে চলল আঙ্কেল টম'স ট্যার্ভানের দিকে।

পুরোটা যেতে হলো না। বড় রাস্তায় অনেকটা এগিয়ে এসে ওদের অপেক্ষায় রয়েছে মুত্তাকিম বিল্লাহ। গাড়ি দাঁড় করাল রানা। ফয়েজ পিছনের দরজা মেলে ধরতেই মাথা নিচু করে অদ্ভুত এক লাফ দিয়ে ভেতরে উঠে বসল সে। আবার টার্ন নিল

রানা। দ্রুত ছুটল টার্নপাইকের দিকে।

'তারপর?' বলল রানা।

'পথের ফকির বানিয়ে রেখে এসেছি কানা ব্যাটাকে,' হাসল বিল্লাহ। 'ওয়ালেট, ক্রেডিট কার্ড, হাতঘড়ি সব এখন আমার পকেটে।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'তার মানে সত্যিই আমাদের অনুসরণ করছিল লোকটা।'

'কোন সন্দেহ নেই। আপনারা রওনা হওয়ার পরমুহূর্তে সে-ও বেরিয়ে আসে। পকেট থেকে চাবি বের করতে করতে ছুটছিল নিজের গাড়ির দিকে।'

আর কোন প্রশ্ন করল না মাসুদ রানা। অন্যরাও বলল না কিছু। নীরব হয়ে পড়ল হঠাৎ করে। বিপদ টের পেয়ে গেছে সবাই। এতক্ষণ পুরো ব্যাপারটা ছিল মজার খেলা গোছের, এখন আর তা নেই। পিছনে শত্রুর অস্তিত্ব এতক্ষণ ছিল কাল্পনিক। এ মুহূর্তে তা বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে শত্রু। এর নাম মাফিয়া।

'কে হতে পারে লোকটা?' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ করল নাদিরা। 'পুলিস? এফবিআই?'

'না,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'গার্সিয়ার লোক। মাফিয়া।'

আবার সবাই চুপ। যেন এই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছে, কার লেজে পা দিয়েছে ওরা। নিউ ইয়র্ক থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরে ওরা মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছিল বিপদ কেটে গেছে। এইবার টের পেল, আসলে সবে শুরু হয়েছে। কেটে যাওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। রানা ছাড়া প্রত্যেকেই থেকে থেকে পিছনে তাকাচ্ছে ঘাড় ঘুরিয়ে, বোঝার চেষ্টা করছে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না ওদের।

'বিল্লাহ,' মৃদু কণ্ঠে ডাকল মাসুদ রানা।

'জ্বি?'

'তুমি যদি গার্সিয়া হতে, আর খবর পেতে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে কামডেনে রয়েছি আমরা, সেক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী হল্টেজ কোথায় হতে পারে বলে ভাবতে তুমি?'

'বাল্টিমোর, অবশ্যই,' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলল দানব। 'ঠিক বলিনি, মাসুদ ভাই?'

সন্তুষ্ট হলো ও। 'ঠিকই বলেছ। আমার মনে হয় গার্সিয়াও তাই ভাবছে। অন্তত সেটাই স্বাভাবিক। অতএব আমাদের এবারকার যাত্রা হবে সংক্ষিপ্ত। আজকের রাতটা উইলমিংটন অথবা এল্‌ক্‌টনে কাটাব আমরা। তারপর কাল দুপুর নাগাদ যাব বাল্টিমোর। ওখানে যতক্ষণ থাকব চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। ওখানে যদি গার্সিয়ার লোক পিছু না নেয়, বুঝতে হবে ওয়াশিংটনে আশা করবে ও আমাদের।'

'মাসুদ ভাই,' বলল ফয়েজ। 'ওরা যদি এরকম আগেভাগেই আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে, তাহলে বিপদ। তারচে' এক কাজ করলে কেমন হয়? যদি নিউ ইয়র্কেই ফিরে যাই আমরা? আর যা-ই হোক, ওখানে নিশ্চই আমাদের আশা করবে না গার্সিয়া? কেমন হয় আইডিয়াটা?'

'অন্য কোন শহর হলে সম্ভাবনাটা ভেবে দেখা যেত, ফয়েজ। কিন্তু নিউ ইয়র্কের ব্যাপারে আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই। অসম্ভব! হাজারো চোখ রয়েছে ওখানে, হাজারো কান। শুধু গেলেই তো হবে না, থাকতেও হবে। কোথায় থাকবে? ওখানে ফিরে যাওয়ার অর্থ হবে নিজ হাতে নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো। অসম্ভব!' তাছাড়া গার্সিয়া এর সাথে নাদিরার জড়িত থাকার কথা যখন জেনেই গেছে, ওর সাথে আমি আছি, তাও

ঠিকই বুঝে গেছে। কাজেই ও-কাজ করা একেবারেই ঠিক হবে না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কি করে ব্যাটা নাদিরার জড়িত থাকার কথা জানল।

'তাহলে? কোথায় যাব আমরা এখন?' জানতে চাইল নাদিরা।

'মায়ামি। এ মুহূর্তে ওটাই হবে আমাদের জন্যে সবচে' উপযুক্ত স্থান। আমরা অতদূর যাব, আশা করা যায়, এতটা কল্পনা করবে না গার্সিয়া।'

দেলাওয়েরের নদী পেরিয়ে এল ওরা, ফার্নহার্স্ট পৌঁছল। শহরটা ওয়াশিংটন শহরের সামান্য দক্ষিণে। সামনেই হাইওয়ে নাইনটি ফাইভ, আন্তঃরাজ্য হাইওয়ে– চলে গেছে ওয়াশিংটন। হাইওয়ে ধরে মায়ামির দিকে এক ঘণ্টা চলল মাসুদ রানা। তারপর খুদে শহর এল্‌ক্‌টনে থামল। রাতটা এখানেই কাটানোর ইচ্ছে। জায়গাটা নিরাপদ। এত ছোট শহরে নিশ্চয়ই ওদের আশা করবে না গার্সিয়া।

ঘড়িতে তখন প্রায় একটা। বড় রাস্তার কাছে একটা পছন্দসই হোটেল খুঁজে বের করল ওরা। দুটো ডবল রূম নিল কামডেনের মত। 'একসঙ্গে সবার ঘুমানো চলবে না আজ রাতে,' বলল ওদের মাসুদ রানা। 'পালা করে পাহারা দিতে হবে। একেকজন দুই ঘণ্টা করে।'

'ঠিক আছে,' বলল ফয়েজ। 'প্রথম পালা আমার।'

যার যার বিছানায় উঠে পড়ল রানা ও নাদিরা। পাশের রূমে দরজা সামান্য খোলা রেখে পাহারায় বসেছে ফয়েজ। এপাশ ওপাশ করতে লাগল মাসুদ রানা, ঘুম আসছে না। মাথায় হাজারো দুশ্চিন্তা। নাদিরার জড়িত থাকার কথা জানল কি করে গার্সিয়া? হ্যামিলটন কেন বলল, নাদিরাকে খুঁজছে সে? হাসানের

কথা মনে পড়ল হঠাৎ করে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। ব্যাপারটা ভুলতে পারছে না ও। তবু এ নিয়ে একটা শও উচ্চারণ করেনি রানা নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করার পর থেকে। তাতে পরিবেশ গুমোট হয়ে যাবে। সেটা চায় না ও। এ মুহূর্তে সবার মন খোলা না থাকলে বিপদের ওপর বিপদ। হাসানের অসহায় মৃত্যু-দৃশ্য ভেসে উঠল চোখে, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল মাসুদ রানা।

'রানা,' মৃদু কণ্ঠে ডাকল মেয়েটি।

'বলো।'

'কিছু ভাবছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি?'

হেসে ফেলল ও। 'কেন?'

'না। এমনিই জানতে চাইছি।'

'ভাবনার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে?'

'তবু। বলো না!'

'প্রথম চিন্তা আমাদের গাড়িটা।'

'গাড়িটা মানে?'

'মানে এই গাড়ি নিয়ে আর পথে বেরোনো ঠিক হবে না।'

'তো?'

'ভাবছি, গাড়িটা কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে।'

'লুকিয়ে রাখবে?'

'হ্যাঁ। বাতিল করে দিতে হবে এটা।'

'কিন্তু তাহলে আমরা বাল্টিমোর যাব কিসে করে? এখানে কি ভাবে কোত্থেকে গাড়ি ম্যানেজ করা যাবে?'

'না। এখানেই ওটা ছাড়ার কথা ভাবছি না। বাল্টিমোর পৌঁছে সারতে হবে কাজটা।'

অন্ধকার আর নীরবতা একসঙ্গে জমাট বাঁধল ঘরের ভেতর। পরমুহূর্তে 'খুট্' শব্দে জ্বলে উঠল মাসুদ রানার গ্যাস লাইটার। সিগারেট ধরাল ও। সিগারেটের মাথার আগুনটা ঘন ঘন বাড়ছে কমছে। এক ভাবে সেদিকে চেয়ে রইল নাদিরা।

সিগারেট শেষ করে আবার শুয়ে পড়ল মাসুদ রানা। কিন্তু ঘুম আর আসে না। গড়াগড়ি করতে লাগল দু'জনেই। কোন ফাঁকে ঘুম এসে জুড়ে বসল চোখের পাতায়, দু'জনের একজনও টের পেল না। ভোর ছ'টায় চট্ করে চোখ মেলল মাসুদ রানা। লোকজন জেগে উঠেছে। সামনের বড় রাস্তা দিয়ে এক আধটা গাড়ি ছুটে যাওয়ার শব্দ আসছে।

পাশের কোন রুমে যেন টিভি চলছে। ভোরের খবর শুরু হয়েছে। খবরের তৃতীয় আইটেমটা কানে যেতেই যেন তড়িতাহত হলো মাসুদ রানা। একঘেয়ে কণ্ঠে পড়ে চলেছে পাঠকগু গত পরশু রাতে, ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর এক অফিসে সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে গিয়ে প্রতিপক্ষের গুলির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত ব্যক্তিটি গত রাতে মৃত্যুবরণ করেছে। জানা গেছে, সে কুখ্যাত মাফিয়া ডন, পাওলো গার্সিয়ার পুত্র রবার্টো গার্সিয়ার বডিগার্ড-কাম-শোফার। লোকটির নাম আলবার্তো ফেলিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত পরশু একদল সশস্ত্র ব্যক্তি ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর বেসরকারী এক গোয়েন্দা সংস্থা, রানা এজেন্সির ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে অফিসটির প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। যদিও এজেন্সির অপারেটরদের পাল্টা মারের মুখে খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি তারা ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ইয়াল্লা!' ফিস ফিস করে বলল নাদিরা। 'কি করে...'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। সিলিঙের দিকে চেয়ে আছে, চাউনি অন্তঃসার শূন্য। ব্যস্ত টোকার আওয়াজ উঠল দরজায়।

'মাসুদ ভাই! মাসুদ ভাই! দরজা খুলুন!' চাপা কণ্ঠে ডাকছে ফয়েজ।

নাদিরা দরজা খুলে দিল। দমকা বাতাসের মত ভেতরে ঢুকল ফয়েজ ও বিল্লাহ। 'খ-খবর শুনেছেন, মাসুদ ভাই?'

'শুনেছি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'ওরা জেনে গেছে আমরাও আছি এর পিছনে!' বলে উঠল বিল্লাহ।

আনমনে থুতনি ডলল ও। 'তাই তো দেখছি।' মাথায় এলোমেলো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে রানার। কি করে গার্সিয়া ব্যাপারটা টের পেল, ভেবে পাচ্ছে না।

সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল মাসুদ রানা। গম্ভীর। তাহলে প্যাট্রিক কার্নিকেও চিনে ফেলেছে গার্সিয়া! অর্থাৎ সেই কাজই হলো, জানাজানি হয়ে গেল সব। কিছুই গোপন রইল না! যে জন্যে পালাতে হচ্ছে। নইলে অন্য কিছু করা যেত ভেবেচিন্তে।

দুই

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই গাড়িটা ছেড়ে দেয়া উচিত আমাদের,' বলল মুত্তাকিম বিল্লাহ। 'এটা নিয়ে আর পথে বের হওয়া ঠিক হবে না।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। খাটের কিনারায় বসে আছে ও, হাঁটুতে কনুই রেখে দু'হাতে মুঠো করে ধরে রেখেছে চুল। দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ।

'কিন্তু এখানে গাড়ি কোথায় পাব?' প্রশ্ন করল ফয়েজ।

'বাল্টিমোর থেকে জোগাড় করতে হবে গাড়ি।' হাত নামিয়ে

সোজা হয়ে বসল মাসুদ রানা। ‘ট্যাক্সি নিয়ে বাল্টিমোর যাও তোমরা দু’জন। তৈরি হয়ে নাও।’

‘এই গাড়ির কি ব্যবস্থা করা যায়?’ বলল ফয়েজ।

‘লুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করো। ভাল হয় যদি নির্জন কোন এলাকায় নিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে দেয়া যায়।’

‘জ্বি, আচ্ছা,’ মাথা দোলাল বিল্লাহ।

‘ফেরার সময় একবারে ট্যাক্সি নিয়ে এসো। আমরা তৈরি হয়ে থাকব।’

‘ঠিক আছে।’ দরজার দিকে এগোল ফয়েজ আর বিল্লাহ।

‘খুব সাবধানে,’ পিছন থেকে সতর্ক করল মাসুদ রানা। ‘চারদিক ভাল করে দেখেশুনে এগোবে। না, দাঁড়াও। ক্যাশ নিয়ে যাও কিছু। দেখো, খুঁজে কোন ইউজ্‌ড্‌ কার কিনতে পাওয়া যায় কি না। সম্ভব হলে চলনসই দেখে কিনেই নিয়ে এসো একটা গাড়ি। ট্যাক্সি খুব রিস্কি হয়ে যাবে।’

‘ওরা যদি নাম জানতে চায় ক্রেতার?’ জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ।

‘চাইবে না,’ মাথা দোলাল মাসুদ রানা। ‘বেশিরভাগ চোরাই গাড়ি কেনা-বেচার কারবার করে এইসব লট। নগদ পয়সা পেলে কোন প্রশ্নই করবে না, আমি জানি। বিক্রি করার সময় একটা শর্ত জুড়ে দেয় ওরা কেবল, তা হলোগু বিক্রেতার নাম প্রকাশ করা চলবে না ধরা পড়লে। অন্তত পুলিসের কাছে। ওটায় বোমা ফিট করে যদি হোয়াইট হাউস উড়িয়ে দেয়ার প্ল্যানও করো তুমি, কিচ্ছু আসবে-যাবে না ওদের।’

এক থোক ডলার ধরিয়ে দিল রানা মুত্তাকিমের হাতে। বেরিয়ে গেল ওরা দু’জন। দরজা বন্ধ করে দিল মাসুদ রানা। একটা চেয়ার টেনে দরজার কাছে বসল। নাস্তার কথা ভুলে

গেছে। সিগারেট টেনে চলেছে একটার পর একটা। নিজের বিছানায় চুপ করে বসে আছে নাদিরা। নিজেকে বড্ডো অপরাধী মনে হচ্ছে তার। এত বড় ঝামেলায় পড়েছে এরা ওরই জন্যে, তার চেয়েও বড় কথা, এর পিছনে মাসুদ রানার হাত আছে, ধরে ফেলেছে রবার্টো গার্সিয়া। আর রবার্টো গার্সিয়া মানেই মাফিয়া।

এক্সপোজড হয়ে গেছে মাসুদ রানা। এত রকম সতর্কতা অবলম্বন করেও কোন লাভ হলো না শেষ পর্যন্ত। কি হবে এখন? একই চিন্তা চলছে রানার মাথায়ও। মাফিয়া পরিবারগুলো যদি এক জোট হয়ে হামলা চালায় রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার ওপর, তাহলে সর্বনাশ। সম্ভাবনাটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিল ও। পাওলো গার্সিয়ার সঙ্গে অন্যান্য ডনের সম্পর্ক ইদানীং ভাল যাচ্ছে না, ব্যবসা নিয়ে কি সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে পরিবারগুলোর মধ্যে, আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছে মাসুদ রানা। কাজেই ওদের এক জোট হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে না ও।

তবু স্বস্তি পাচ্ছে না মাসুদ রানা। বার বার খারাপ চিন্তা উঁকি দিচ্ছে মনের মধ্যে। পুলিস বা এফ.বি.আই-কে রবার্টো কি জানিয়েছে যে এর পিছনে মাসুদ রানা আছে? নাকি গোপন করে গেছে? একাই মোকাবিলা করবে সে ওকে? তাই যেন হয়, মনে মনে প্রার্থনা করছে রানা, তাই যেন হয়। ব্যাপারটা রবার্টো যদি প্রশাসনকে জানায় তাহলে জটিলতা দেখা দেবে। অথচ ওসব এড়ানোর জন্যেই অফিশিয়ালি পদক্ষেপ নিতে বারণ করেছিলেন ওকে রাহাত খান।

ঠিক আছে, বেপরোয়া এক সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা, দেখা যাক কতদূর গড়ায় ব্যাপারটা। তারপর চরম পদক্ষেপ নেবে ও প্রয়োজনে। সে ব্যবস্থা করেই এসেছে। ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা।

নাদিরাকে দেখল। 'অনর্থক দুশ্চিন্তা করছ তুমি। এ কাজে আমাকে তুমি বাধ্য করোনি, আমি স্বেচ্ছায়ই কাজটা নিয়েছি। কাজেই নিজেকে অপরাধী ভাবার কোন কারণ নেই তোমার। যাও, ওঠো। তৈরি হয়ে নাও। খিদে লেগেছে, পেটে দিতে হবে কিছু।'

ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে থাকল মেয়েটি কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে উঠল। নিঃশব্দ পায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। বাইরে নজর দিল মাসুদ রানা। ক্রমেই ব্যস্ত হয়ে উঠছে খুদে এল্‌ক্‌টন। সামনের বড় রাস্তায় বাস, কার ইত্যাদির দ্বিমুখী ট্রাফিক ক্রমেই ঘন হচ্ছে। স্বাভাবিকের তুলনায় দেশের অন্যান্য জায়গার মত এখানেও প্রচণ্ড চাপ পড়েছে রাস্তার ওপর। বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হতে যাচ্ছে, আগেভাগেই যে যার পছন্দের জায়গায় ছুটছে দিনটা পালনের জন্যে। দেখতে দেখতে আরও ঘন হলো ট্রাফিক। মৃদু হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। এই ট্রাফিক খুবই উপকারে লাগবে ওদের।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলল, এখনও ফেরার নাম নেই বিল্লাহ্ ও ফয়েজের। চিন্তায় পড়ে গেল রানা। কোন বিপদ হলো না তো? ধরা পড়ে যায়নি তো ওরা রবার্টোর লোকজনের হাতে? ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল মাসুদ রানা। নাদিরা বসে আছে নিজের বিছানায়। চুপ হয়ে গেছে মেয়েটি। রানার সান্ত্বনা কোন কাজে আসেনি, ওকে দেখলেই বোঝা যায়। এক এক করে চারটে সিগারেট ধ্বংস করল মাসুদ রানা।

পঞ্চমটা ধরাতে যাবে, এই সময় হোটেলের গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকল ভেতরে। থেমে গেল মাসুদ রানা। ওটার ভেতরে বসা দেখা গেল বিল্লাহ আর ফয়েজকে। আশ্বস্ত হয়ে গাড়িটা দেখল ও, একটা কালো রঙের বুইক রিভেরা। হুইলে গর্বিত ভঙ্গিতে বসে

আছে বিল্লাহ। বুইকটা পুরানো। সাইড প্যানেলে কিছু কিছু স্ক্র্যাচ দেখা গেল। সামনের ফেণ্ডার সম্ভবত কোন দুর্ঘটনায় তুবড়ে গিয়েছিল, পরে মেরামত করা হয়েছে। রং-ও করা হয়েছে। দেখতে একেবারে মন্দ লাগছে না বুইকটা। এঞ্জিনের আওয়াজও ভালই মনে হলো রানার।

সব তৈরিই ছিল, টপাটপ বুইকের ট্রাঙ্কে তুলে ফেলল ওরা মালপত্র। 'দেখতে যেমনই হোক, গাড়িটা চলে ভাল, মাসুদ ভাই,' ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করে বলল ফয়েজ। 'এঞ্জিনটা প্রায় নতুন, কোন বাজে আওয়াজ নেই।'

'আরও ভাল, প্রায় নতুন গাড়িও পেয়েছিলাম,' বলল বিল্লাহ। 'কিন্তু ইচ্ছে করেই নিলাম না মানুষের চোখ পড়তে পারে বলে। এটার দিকে দ্বিতীয়বার কেউ তাকাবে না।'

'ঠিকই করেছ,' বলল মাসুদ রানা। বুইকের এঞ্জিন আর ভেতরটা দেখল ও। চমৎকার! ভেতরে জায়গা অনেক বেশি, হাত-পা ছড়িয়ে আরামে বসতে পারবে ওরা অনায়াসে। এঞ্জিনও যথেষ্ট শক্তিশালী। 'দারুণ গাড়ি। কিনতে কোন অসুবিধে হয়নি?'

'নাহ্!' গামলার মত প্রকাণ্ড মাথাটা এপাশ ওপাশ দোলাল বিল্লাহ। 'কোন প্রশ্নই করেনি লট মালিক, নগদ টাকা দেখে ঠাণ্ডা মেরে গেছে একেবারে। প্রায় জোর করেই আমার একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখিয়েছি আমি তাকে। অবশ্য বেশ পুরনো লাইসেন্স ওটা, নাম-ঠিকানা ভুয়া।'

'একেবারে কিছুই জানতে চায়নি?' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা।

'না।' হাসল ফয়েজ আহমেদ। 'সে সুযোগই দেয়নি লোকটাকে তার বউ।'

'কি রকম?'

'ঘর-সংসার ছেড়ে বউ এসে বসে ছিল স্বামীর ঘাড়ের ওপর, বড়দিনের কেনাকাটার টাকা চাই। বিল্লাহর হাত থেকে টাকাটা সে-ই নিয়েছে, ইন ফ্যাক্ট্, কেড়ে নিয়েছে বলা চলে। স্বামী বেচারীকে দরদাম করার সুযোগটাও দেয়নি দজ্জাল মহিলা, আমরা গাড়ির চাবি হাতে পাওয়ার আগেই টাকা নিয়ে গায়েব হয়ে গেছে সে।'

হেসে ফেলল মাসুদ রানা। 'ভেরি গুড।' দেখাদেখি নাদিরাও হাসল।

'ওদের সামনে পিটসবার্গের রুট নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা,' বলল বিল্লাহ। 'কোন পথে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, এইসব। খবরটা যদি কোনরকমে পৌঁছায় রবার্টোর কানে, মিসগাইডেড হওয়ার চান্স আছে লোকটার।'

'চমৎকার!'

মাসুদ রানা বসল ড্রাইভিং সীটে, পাশে ফয়েজ আহমেদ। নাদিরা ও বিল্লাহ উঠল পিছনে। নাদিরার রত্নভাণ্ডারের ব্রিফকেসটা থাকল ওদের মাঝখানে। হ্যাণ্ড রেস্ট হিসেবে ব্যবহার করছে ওটাকে বিল্লাহ। শহর ছাড়ার আগে কিছু কেনা-কাটা করল ওরা, তারপর ফিরে চলল আন্তঃরাজ্য হাইওয়ে নাইন্টি ফাইভের দিকে। হাইওয়েতে উঠে বুইক দক্ষিণমুখো ছোটাল মাসুদ রানা। 'ফোর্ডটার কি ব্যবস্থা করলে তোমরা?'

'আপনি যেমন বলেছিলেন, তেমন উপযুক্ত জায়গা একটাই পেয়েছিলাম, মাসুদ ভাই,' বলল বিল্লাহ। 'কিন্তু এত বেশি ট্রাফিক যে ও কাজ করার কোন সুযোগই ছিল না। সারাদিন অপেক্ষা করলেও হত না সুযোগ। সেজন্যেই তো এত দেরি হয়ে গেল ফিরতে আমাদের।'

'তো?'

‘এ অবস্থায় আপনি হলে কি করতেন?’ পাল্টা প্রশ্ন করল ফয়েজ আহমেদ।

‘আমি? লোকালয় থেকে দূরে কোন গভীর জঙ্গলে নিয়ে ঢোকাতাম গাড়িটা। তার পরও প্রয়োজন বুঝলে ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিতাম ওটাকে। লাইসেন্স প্লেট খুলে নদীতে ফেলে দিতাম। অথবা, সুবিধেমত জায়গা খুঁজে বের করে আস্ত গাড়িটাই ফেলে দিতাম নদীতে।’

‘ওতে কারও কোন উপকার হত না। কিন্তু আমরা যা করেছি, তাতে আমাদের সঙ্গে আরও কিছু লোকের উপকার হয়েছে।’ পায়ের ওপর পা তুলে বসল পাহাড়। সিগারেট ধরাল গম্ভীর মুখে। ফয়েজ হাসছে মিটিমিটি।

চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। ‘যেমন?’

‘ওটা গায়েব করার আর কোন উপযুক্ত জায়গা না পেয়ে শহরের একটা বস্তিতে নিয়ে পার্ক করে রাখি আমরা গাড়িটা,’ বলল ফয়েজ। ‘লাইসেন্স প্লেট আগেই লুজ করে রেখেছিলাম। ও দুটো খুলে নিয়ে দরজা আনলক রেখে কার লটের খোঁজে চলে যাই।’

‘তারপর?’ সিগারেট ধরাল রানা।

‘ঘণ্টা দু’য়েক ব্যয় হয় এটা কিনতে। কাজ সেরে বুইক নিয়ে আবার বস্তিতে যাই আমরা। ওর মধ্যেই ফোর্ডের হুইল, ব্যাটারি, কারবুরেটর, রেডিয়েটর, ডিস্ট্রিবিউটরসহ পুরো এঞ্জিন ব্লক গায়েব হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখলাম, সীটগুলো, ফুয়েল পাম্প খুলে নিয়ে যাচ্ছে একদল নিগ্রো ছোঁড়া। ঘণ্টা খানেক ছিলাম আমরা ওখানে। আসার সময় কেবল ফ্রেমটা পড়ে আছে দেখে এসেছি। দরজা, ফ্রন্ট আর ব্যাক উইণ্ডশীল্ড, সব গাপ্ করে দিয়েছে ব্যাটারা।’

‘এখন গেলে ফ্রেমটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, বাজি ধরে বলতে পারি আমি,’ মন্তব্য করল পাহাড়। ‘বড়দিনটা এবার ভালই কাটবে ছোঁড়াগুলোর।’

‘দারুণ!’ বলল মাসুদ রানা। ‘রীতিমত একটা অত্যাধুনিক উপায় আবিষ্কার করেছ তোমরা গাড়ি গায়েব করার। ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়লে উপায়টা কাজে লাগাব ভাবছি। কংগ্রাচুলেশনস!’

‘বৈপ্লবিক উপায়।’ সংশোধন করে দিল বিল্লাহ্।

‘ঠিক,’ মেনে নিল রানা। ‘বৈপ্লবিক উপায়।’

একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠতে শুরু করল নাদিরা। মাঝে মধ্যে ওদের আলোচনায় যোগ দিচ্ছে সে এখন। মাসুদ রানা এবং তার দুই সহযোগীর সতর্ক, কিন্তু নির্ভীক, ড্যাম কেয়ার ভাব-ভঙ্গি দেখে ভুলে গেল সে ভয়-শঙ্কা, অপরাধবোধ।

সন্ধে গড়িয়ে রাত নামল। হাইওয়ে নাইন্টি ফাইভ ধরে তুমুল বেগে ছুটছে বুইক। হুইলে তিনটে বাজার ভঙ্গিতে রয়েছে মাসুদ রানার হাত। ঋজু দেহটা বসে আছে অনড়। নজর সামনে স্থির। ড্যাশবোর্ডের মৃদু নীলাভ আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চেহারাটা। কিছু ভাবছে ও। নাদিরা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগেই। বিল্লাহ্ আর ফয়েজ বসে আছে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত এক মিনিটের জন্যেও চোখ বোজেনি ওরা কেউ। ভবিষ্যৎ ভাবনায় ডুবে আছে সবাই।

দূর থেকে ওয়াশিংটন ডি. সি. পাশ কাটাল মাসুদ রানা। বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে আলোর বন্যায় ভাসছে ওয়াশিংটন। পুরো আকাশ গোলাপী রঙের উজ্জ্বল আভায় ঝলমল করছে। ফ্রেডারিক্স্বার্গের এক স্পেনীয় ধাঁচের রেস্টুরেন্টে ডিনার খেলো ওরা। তারপর আবার চলা। এবার হুইলে বসল বিল্লাহ, মাসুদ রানা পিছনে। শহর ত্যাগ করার আগে ট্যাঙ্ক ভরে তেল নিল

ওরা। রিচমণ্ড এসে আরেক দফা আসন বদল হলো বিল্লাহ এবং ফয়েজের মধ্যে।

কাত হয়ে নাদিরার ব্রিফকেসে হেলান দিয়ে খানিক ঘুমিয়ে নেয়ার কসরৎ করল মাসুদ রানা। কাজ হলো না। উল্টে শক্ত জিনিসটার ওপর পড়ে থেকে থেকে কাঁধ-পিঠ ব্যথা হয়ে গেল। সাড়ে দশটার দিকে রকি মাউন্টেন পৌঁছল ওরা। তন্দ্রায় চোখ বুজে এসেছিল কখন যেন, চট করে সোজা হয়ে বসল রানা। বিল্লাহ আর নাদিরা ঘুমিয়ে পড়েছে। গতি কমে গেছে বুইকের। 'এটা কোন জায়গা?' জানতে চাইল ও।

'রকি মাউন্ট,' বলল ফয়েজ।

'দেখো কোন জয়েন্ট পাওয়া যায় কি না।'

'ঠিক আছে।' বড় রাস্তা ছেড়ে ডাইনে বাঁক নিল ফয়েজ। সামান্য এগোতেই নীল রঙের নিয়ন আলো চোখে পড়ল। একটা বার অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট, 'দি গেম কক'। জানালায় বিয়ার ক্যানের ছবি পেস্ট করা আছে দেখা গেল।

'চলো দেখি, কফি জোটে কি না দু'এক কাপ।'

বিল্লার ঘুম আগেই ভেঙেছে, নাদিরাও জেগে গেছে। সোজা হয়ে আড়মোড়া ভাঙল সে। 'কোথায় এসেছি আমরা?'

'রকি মাউন্টেন,' বলল মাসুদ রানা।

'এখানে কি?'

'কফি খাব।'

'ওহ্, ফাইন!'

গেম ককের পার্কিং লট বেশ বড়। আধ ডজন কার, একটা পিকআপ ট্রাক, দুটো মোটর সাইকেল এবং অতিকায় এক ট্রাক্টর ট্রেইলার দাঁড়িয়ে আছে ভেতরে। ধীর গতিতে বুইকের নাক ঢোকাল ফয়েজ লটে। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রানা ও

বিল্লাহ। আলো নেভাল ফয়েজ, স্টার্ট বন্ধ করে দিল। তখনই বেরিয়ে পড়ল না ওরা, ঝাড়া দু'মিনিট বসে থাকল গাড়িতে। না, কোথাও কোন অস্বাভাবিক তৎপরতা চোখে পড়ল না। কোন অ্যাডভান্স পার্টি অপেক্ষা করছে না ওদের স্বাগত জানাতে।

'চলো,' মৃদু কণ্ঠে নির্দেশ দিল মাসুদ রানা। নাদিরার খুদে কেসটা বাঁ হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। ডান হাত ট্রাউজারের পকেটে, ওয়ালথারের বাঁট আঁকড়ে রেখেছে আঙুলগুলো।

ফয়েজ নামল সবার শেষে। বুইক লক করল সে, তারপর একযোগে গেম ককের প্রবেশ পথের দিকে পা বাড়াল সবাই। ভেতরের আলোগুলো কম শক্তির। নগ্ন কাঠের মেঝে, সারা দেহে তার ক্ষত। প্রায় চৌকোনা গেম কক বার অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট। এক মাথায় আধা-নোংরা বার। সামনে কোন টুল নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করা ছাড়া উপায় নেই খদ্দেরের।

দু'পাশে গোটা বিশেক গোল কাঠের টেবিল, প্রত্যেকটি ঘিরে রেখেছে এক হালি করে চেয়ার। বেশিরভাগই নড়বড়ে। এক পাশে কয়েকটা বুদও আছে। মাঝখানের খানিকটা জায়গা ফাঁকা, ডান্স ফ্লোর। অল্প শক্তির আলো আড়াল করতে পারেনি ভেতরের দীনতা, বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বেশি বেশি। বারের পিছনে দেয়ালে ঝুলছে একটা নোংরা মূল্য তালিকা, হ্যামবার্গারস্, রিব্স্, চিলি, হ্যাম ও চীজ বার্গার, অ্যাপেল পাই ও কফি ইত্যাদির।

বারের পাশেই একটা করিডর, চলে গেছে পিছনদিকে, গেম ককের কিচেনে। ভেতরে পা রেখেই টের পেল ওরা পিছনে রান্না চলছে। তেল মশলার ঝাঁঝে চোখে অন্ধকার দেখল সবাই। পাঁচ পুরুষ খদ্দের বীয়ার পান করছে বারের সামনে দাঁড়িয়ে। উভয় লিঙ্গ মিলিয়ে আরও জনা চল্লিশেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে

সামনের টেবিল ও বুদ দখল করে। উৎসব উৎসব আমেজ।

মেয়েদের বেশিরভাগই কম বয়সী, ষোলো থেকে বিশের মধ্যে। এক নজরেই বোঝা যায় পেশাদার। পরনে টাইট সোয়েটার, পায়ে হীল, মাথায় লাল অথবা সোনালী উইগ। মুখে এত কড়া মেক আপ, সার্কাসের ক্লাউনও হার মানতে বাধ্য হবে। পুরুষরা সব কঠোর চেহারার, লাল মুখো। কয়েকজনের চোখেমুখে দীর্ঘ যাত্রার ছাপ স্পষ্ট। বাকিরা কেউ চাষী, নির্মাণ শ্রমিক, টেলিফোনের লাইনসম্যান এইসব।

একাধিক পায়ের আওয়াজে ভেতরের কলগুঞ্জন থেমে গেল আচমকা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সবাই। শূন্য, অস্পষ্ট শত্রু ভাবাপন্ন চোখে দেখল আগন্তুকদের। সবচেয়ে বেশি সময় তাদের নজর কাড়ল নাদিরা। তারপর পাহাড় এবং সবশেষে গরিলা। পুরুষরা মাসুদ রানাকে দেখেও না দেখার ভান করল। মেয়েরা খানিকটা করুণা করল রানাকে। একবার, কেউবা দু'বারও তাকাল। কিন্তু কারও মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না।

সুইচ টিপে সবার কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা বন্ধ করে দিয়েছিল যেন কেউ, ওরা একটা বুদে ঢুকে পড়তেই অন হয়ে গেল সেটা, যে যেখানে থেমে পড়েছিল, সেখান থেকে শুরু হলো আগের মত। নোংরা কৌতুক আর পাঞ্জার লড়াইয়ে মেতে উঠল পুরুষরা, আর মেয়েরা অহেতুক গা কাঁপানো খিল খিল হাসি, মেক আপ ঠিক করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে।

ওরা ঠিকমত বসতে না বসতেই হাজির হলো এক ওয়েট্রেস। খুব বেশি হলে পনেরো হবে তার বয়স, কিন্তু মুখ দেখলে বেশি মনে হয়। সাংঘাতিক রকম টাইট জিনস পরেছে মেয়েটি, গায়ে পেট কাটা লো-কাট উলেন ব্লাউজ, তাও স্লিভলেস। এই শীতে কী করে মেয়েটি এত সংক্ষিপ্ত পোশাকে আছে ভেবে পেল না ওরা।

মেন্যু আঁতিপাতি করে খুঁজে একমাত্র চীজ স্যাণ্ডউইচ ছাড়া আর কিছুই খাওয়ার উপযুক্ত মনে হলো না রানার। অতএব নিজের জন্যে ওর একটা এবং এক কাপ কালো কফি অর্ডার দিল ও। ফয়েজ আর বিল্লাহ অনুসরণ করল ওকে। নাদিরা শুধু কফির অর্ডার দিল। চলে গেল মেয়েটি নিতম্ব দোলাতে দোলাতে। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে ছিল ফয়েজ, টেবিলের তলা দিয়ে তার হাঁটুতে কষে এক লাথি লাগাল বিল্লাহ।

'বাবাগো!' লাফিয়ে উঠল গরিলা।

লাফিয়ে উঠল মাসুদ রানাও, মুহূর্তে ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে হাতে। 'কি! কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল ও।

ভাল মানুষের মত বিল্লাহও চমকে উঠল। 'কি হলো?'

ব্যথা পাওয়া জায়গাটা ডলতে লাগল ফয়েজ মুখ বিকৃত করে। 'তেমন কিছু না, মাসুদ ভাই,' অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল সে। ঠাণ্ডা চোখে বিল্লাহর প্রতি শাসানি। 'অনেক আগে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছিলাম একবার পড়ে গিয়ে, ফুটবল খেলার সময়। হঠাৎ হঠাৎ কামড়ে ওঠে জায়গাটা।'

'তাই বলো,' আশ্বস্ত হলো যেন বিল্লাহ। চেহারা নির্বিকার। 'আমি তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম।'

'ডাক্তার দেখাও না কেন?' মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল রানা। 'কই, দেখি! কোথায় ব্যথা?' ঝুঁকল ও।

হাঁ হাঁ করে উঠল ফয়েজ। 'না না! দেখতে হবে না, মাসুদ ভাই। ঠিক হয়ে গেছে। ও কিছু না।'

সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল মাসুদ রানা। 'এত তাড়াতাড়ি সেরে গেল?'

'জ্বি। যেমন হঠাৎ শুরু হয়, তেমনি হঠাৎ করেই সেরে যায়।' বিল্লাহর দিকে তাকাল ফয়েজ। চাউনি 'মজা টের পাবে পরে'

গোছের।

বড় একটা ট্রে নিয়ে ফিরে এল ওয়েট্রেস। খালি করতে লাগল ওটা। 'মিস্, তোমাদের রেস্টরূমটা কোনদিকে?' জানতে চাইল নাদিরা।

'থ্রু দ্যা কিচেন,' বলল সে। শোনাল যেন 'থ্রু ডাহ্ কিচ'।

'আমি যাব প্রথমে।' আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। 'ওদিকটা চেক করে দেখা হয়নি। একটু অপেক্ষা করো।' বারের পাশের করিডর দিয়ে হেঁটে চলে গেল মাসুদ রানা। লক্ষ করল নাদিরা, অল্পবয়সী, মোটামুটি সুন্দরী একটি মেয়ে পিছু নিয়েছে ওর। সে-ও যাচ্ছে রেস্টরূমের দিকে। মুচকে হেসে চোখ ফিরিয়ে নিল নাদিরা, চুমুক দিল কফির কাপে। কি ভাবল কে জানে, হঠাৎ করে নাক-মুখ লাল হয়ে উঠল তার।

তিন মিনিট পর ফিরল মাসুদ রানা। তার আগেই হতাশ মুখে ফিরে এসেছে মেয়েটি। 'মেন'স রূম বা' উইমেন'স রূম বলে কিছু নেই এদের। খাড়া কফিন সাইজের একটা টয়লেট আছে কেবল। তবে সাবধান, ভেতরে ঢুকে যদি দম বন্ধ না রাখতে পারো, নির্ঘাত বমি হয়ে যাবে।' নিজের আসনে বসে পড়ল ও।

'আর রান্নাঘর পার হওয়ার সময় চোখ বন্ধ রাখবে। নইলে তেল-মশলার ঝাঁঝে চোখ জ্বলে-পুড়ে যাবে। এখানকার হেলথ ইনসপেক্টররা কি করে বুঝি না,' গজ গজ করে উঠল রানা।

খাঁটি কথাই বলেছে মাসুদ রানা, জায়গামত পৌঁছে ভাবল নিরুপায় নাদিরা। খাড়া কফিনই বটে। উঁচু ছয় ফুট, পাশে তিন ফুট। কপালে লেখা আছে 'টয়লেট'। তার পাশেই রাজ্যের দাগ পড়া একটা ওয়াশ বেসিনের বাচ্চা। তার ওপর ছোট্ট একটা নোটিস বোর্ড। ওতে লেখাগু কর্মচারীদের ল্যাভেটরি ত্যাগ করার আগে অবশ্যই হাত ধুয়ে নিতে হবে।

অথচ ওটার পাশের সোপ স্ট্যাণ্ড শূন্য—সাবান নেই। ট্যাপে গরম পানি নেই। হুকে রোলার টাওয়েলের যেটুকুও বা আছে, চেহারা দেখে মনে হয় কয়লার ট্রাক ঝাড়মোছ করা হয়েছে বুঝি তা দিয়ে।

পিছনে একটা দরজা আছে গেম ককের, বাজার-সওদা সরাসরি ওই পথে কিচেনে ঢোকানো হয়। এ মুহূর্তে দরজাটা পাহারা দিচ্ছে বিল্লাহ, মাসুদ রানার নির্দেশে। কোন রকমে দায় সেরে বেরিয়ে এল নাদিরা। আরেকবার এদিক ওদিক তাকাল। কিচেনের পিছনে ছোট একটা হলওয়ে চোখে পড়ল এবার। পাশাপাশি দুটো ফোন বুদ রয়েছে ওখানে। তার ওপাশে একটা সোয়েল ভেনডিং মেশিন।

হাঁ করা পটে উপযুক্ত মূল্য ফেলে দিলেই জ্যান্ত হয়ে ওঠে মেশিনটা। নিঃশ্বাস বিশুদ্ধকরণ মিন্ট, পারফিউম, চিরুনি, টিস্যু, কনডম ইত্যাদি বিক্রি করে ওটা।

কিচেন পাশ কাটাবার সময় ঘৃণায় গা রি রি করে উঠল নাদিরার। মেঝেতে কাদার মত থক থক করছে তেল-মশলা। দেয়ালের অবস্থাও প্রায় তাই। পার্থক্য কেবল, ওখানে শক্ত হয়ে জমে আছে ওই দুই বস্তু। খোঁচা দিলে নিঃসন্দেহে দুই ইঞ্চি পুরু চলটা উঠে আসবে। ভেতরে এক মেয়ে, আর এক পুরুষ কুক কাজ করছে। রান্নাঘরের চাইতেও শোচনীয় তাদের চেহারা।

তাড়াতাড়ি বুদে ফিরে এল নাদিরা। আরেকটু দেরি হলে বাথরূম নয়, বরং কিচেনই ওর বমি হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াত। বাকি তিনজনও তলপেটের ভার মুক্ত হয়ে এল এক এক করে। তারপর আরেক রাউণ্ড কফি। খাওয়ার বিল মেটাল মাসুদ রানা, আশাতিরিক্ত টিপস দিল পেট কাটাকে। 'চলো।'

আসন ছাড়ল সবাই। ব্রিফকেসটা ফয়েজের হাতে দিল রানা।

দরজার দিকে পা বাড়াল আগে আগে। ডান হাত আগের মতই ট্রাউজারের পকেটে। দরজা খুলে বাইরে পা রাখল মাসুদ রানা। অন্যরাও বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডা, নির্মল বাতাসে দম নিল সবাই। মনে হলো যেন জাহান্নাম থেকে বেরিয়েছে ওরা। আকাশের দিকে তাকাল নাদিরা, তারায় তারায় হাসছে অসীম আকাশটা।

রানার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, স্থির হয়ে গেল। আকাশ দেখছে না রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। 'বিল্লাহ!' চাপা কণ্ঠে বলে উঠল ও, 'ফয়েজ! সামনে দেখো, ডানে।'

একযোগে তাকাল ওরা তিনজন। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো রঙের গাড়ি। এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, ওদের বিশ গজ দূরে। দু'পাশে দুটো কাঠামো, ভারি টপকোটের দুই পকেটে হাত ভরে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত। বাঁ দিকেও আছে আরেকটা গাড়ি। ওটার পাশেও দুটো কাঠামো। দাঁড়ানোর ভঙ্গি অবিকল এক। ভেতরে আরও লোক আছে নিশ্চয়ই ভাবল রানা।

যেন রিহার্সাল দেয়াই ছিল, একই সঙ্গে জ্বলে উঠল দুই গাড়ির চারটে শক্তিশালী হেডলাইট, সরাসরি ওদের ওপর এসে পড়ল আলো। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই দপ্ করে নিভে গেল।

'ভেতরে চলো,' মৃদু, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'ঘাবড়িয়ো না। দৌড় দেবে না কেউ। মুভ!'

তিন

ধীর পায়ে পিছিয়ে এল ওরা। ঢুকে পড়ল ভেতরে। বুদে বসার ঝুঁকি নিল না মাসুদ রানা, সদলবলে বারের সামনে এসে দাঁড়াল।

'ফিরে এলেন যে?' কণ্ঠ এবং চাউনি, দুটোতেই বিস্ময় বারটেণ্ডারের। 'হার্ড কোন ড্রিঙ্ক চাই?'

'না হে,' গম্ভীর গলায় বলল বিল্লাহ। 'তোমাদের কফি খুব ভাল লেগেছে। তাই আরেক কাপ করে খাব বলে এলাম।'

'নিশ্চই নিশ্চই!' ব্যস্ত হয়ে উঠল লোকটা। 'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ।' তুড়ি বাজিয়ে আরেক ওয়েট্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

ওদিকে ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে নাদিরা। ঠোঁট কাঁপছে তার আতঙ্কে। সন্ত্রস্ত চোখে ঘন ঘন প্রবেশ পথের দিকে তাকাচ্ছে। 'স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করো,' মৃদু কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'এত লোকের সামনে কিছু করতে সাহস পাবে না ওরা। কাজেই ভয়ের কিছু নেই। শান্ত হও।'

কিসের শান্ত! কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল বরং মেয়েটির। কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো প্রথমবার, গলা বুজে গেছে। কেশে পরিষ্কার করতে হলো। 'পি-পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি না আমরা?' আতঙ্কিত গলায় বলল সে অনেক কষ্টে।

'না, পারি না।' ভেতরে যা-ই থাক, মুখে সাহসী ভাবটা জোর করে ফুটিয়ে রেখেছে মাসুদ রানা। 'কারণ পিছনদিকেও লোক

আছে ওদের। না থেকে পারে না। ওরা প্রফেশনাল। কিন্তু তাই বলে...'

থেমে গেল ও। কফি নিয়ে এল ওয়েট্রেস। টেণ্ডারের হাতে দশ ডলারের নোট একটা ধরিয়ে দিল রানা। বাকি পয়সা ফেরত দিতে যাচ্ছিল সে, হাত নেড়ে নিষেধ করল ও। 'কীপ দা চেঞ্জ।' লোকটা সামনে থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত মুখ খুলল না কেউ। বিল্লাহ ও ফয়েজ গম্ভীর। অন্যমনস্কের মত ফড়াৎ ফড়াৎ চুমুক দিচ্ছে কাপে। চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন মনে হয় না ওদের কাউকে। গেরো থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে ব্যস্ত বোধহয়।

বারে কনুইয়ের ভর দিয়ে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়াল মাসুদ রানা। গালগল্পে মশগুল অন্য খদ্দের, বিশেষ করে পুরুষদের দিকে নজর দিল। কারও আচরণে সন্দেহজনক কিছু দেখল না ও। কেউ লক্ষ করছে না ওদের। 'কফি খাও!' কঠোর গলায় প্রায় দাবড়ি লাগাল রানা নাদিরাকে। 'স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করো। বলেছি তো, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ভেতরে কোন চর নেই ওদের। এবং ভেতরে ঢুকে এত লোকের সামনে কিছু ঘটাতে পারে, সে সম্ভাবনাও নেই। ওরা বাইরেই অপেক্ষায় থাকবে আমাদের। ব্যাটারা ভালই বোঝে, সারা রাত গেম ককে থাকব না আমরা। যখনই হোক, বের হবই।'

'কিন্তু কেন?' তাড়াতাড়ি কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলল নাদিরা। 'আমাদের ধরার জন্যে এত সময় নষ্ট না করে আমাদের গাড়িটা তো সামনেই আছে, বুট ভেঙে মালপত্র যা আছে নিয়ে নিলেই তো পারে!'

'ওরা বোঝে ওখানে সব মাল নেই। তাছাড়া শুধু মালে সন্তুষ্ট হবে না রবার্টো, আমাদেরকেও চাই তার।'

'আসলেই রবার্টোর লোক ওরা, না এফ.বি.আই?'

‘রবার্টোর লোক,’ দৃঢ় স্বরে বলল মাসুদ রানা। ‘সে নিজেও আছে নিশ্চই। এফ.বি.আই হলে গেম ককের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেত এতক্ষণে। সার্চলাইট, বুলহর্ন, টিয়ার গ্যাস ইত্যাদি নিয়ে অ্যাকশনে নেমে পড়ত তারা, বাইরে অপেক্ষা করত না এই শীতের মধ্যে। তাছাড়া আমার ধারণা, এফ.বি.আইকে আমাদের পিছনে লাগার মত সূত্র দেয়নি রবার্টো। দেবেও না। তাতে সে-ই বিপদে পড়বে। কারণ প্রশাসনকে সে যা জানিয়েছে, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি টাকার মাল হাতছাড়া হয়ে গেছে রবার্টোর। সে চাইবে না বিষয়টা জানাজানি হোক। সবাই জেনে যাক, আমেরিকার সব বড় বড় জুয়েলারি দোকানের ডাকাতি হওয়া মাল তার সেফে ছিল, তাদের অরিজিনাল সীল-ছাপ্পর সুদ্ধ। বিষয়টা যদি কোন রকমে লীক করে, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে পত্রিকাওয়ালারা। ফলে গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স তো যাবেই, ফেডদেরও বারোটা বেজে তেরোটা ঝুলে পড়বে। তখন সাহায্য করা দূরে থাক, তারাই উল্টে গারদে পুরতে বাধ্য হবে রবার্টোকে, মুখ রক্ষার জন্যে হলেও। কিন্তু…! একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, ব্যাটা আমাদের খোঁজ কি করে পেল?’

‘আমিও তাই ভাবছি,’ বলল ফয়েজ।

‘তোমাদের পিটসবার্গের টোপ গেলেনি দেখছি ব্যাটা।’ সিগারেট ধরিয়ে তরল কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

মুখ কালো হয়ে গেল বিল্লাহর। ফয়েজের দিকে তাকাল সে। ‘আশ্চর্য! আমি এর মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কি করে খোঁজ পেল ওরা আমাদের!’

‘নিশ্চই কার ডিলারের…’ থেমে গেল ফয়েজ রানাকে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দেখে।

‘মনে হয় না,’ বলল ও। ‘এল্‌ক্‌টন থেকে আমাদের পিছু

নেয়নি ওরা, আমার যতদূর বিশ্বাস। তাই যদি হত, ফ্রেডারিক্স্বার্গেই ঘেরাও করত আমাদের ওরা, ডিনারের সময়।'

'তাহলে?' হতভম্ব দেখাল ফয়েজকে।

আরেকবার ভেতরের সবার ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। 'এখান থেকেই কেউ জানিয়েছে ওদের খবরটা। সে যাক্, এখন বের হওয়ার উপায় বের করতে হবে তাড়াতাড়ি। মাথা খাটাও সবাই, বোকা বানাবার চেষ্টা করতে হবে ওদের।'

'পেয়েছি!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিল্লাহর। 'মাসুদ ভাই, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই আমি। শব্দ শুনে সামনের ওরা ছুটে আসবে, সেই সুযোগে আপনারা দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠবেন।'

'আর তুমি?' প্রশ্ন করল ফয়েজ। কপাল কুঁচকে আছে তার।

'আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা ঠিকই...'

'চোপ!' খ্যাঁক করে উঠল গরিলা। 'দেশে আমার একটা বকরি আছে দাড়িওআলা, ওটা এখানে থাকলে তোমার থেকে ভাল কোন বুদ্ধি দিতে পারত বোধহয়।'

কটমট করে তাকাল বিল্লাহ। 'কি বললে?'

'বলছিলাম...'

'থামো তোমরা।' বিল্লাহর কাঁধে একটা হাত রাখল মাসুদ রানা। 'আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ইচ্ছে। ধন্যবাদ, বিল্লাহ। কিন্তু ওরা সবাই পিছনে ছুটে আসবে, তোমার এই ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। কেউ না কেউ থাকবেই সামনের দিকে। তাকে অসতর্ক মুহূর্তে ঘায়েল করে আমরাও হয়তো গাড়িতে চড়তে পারব, কিন্তু বিনিময় মূল্য অনেক বেশি পড়ে যেতে পারে। তোমাকে হয়তো হারাতে হবে আমাদের। আমি রাজি নই তাতে। ফয়েজও নিশ্চই সেটাই মীন করেছে।'

'ঠিক বলেছেন।' সিগারেট ধরাল ফয়েজ বিরক্ত মুখে। 'লম্বা মানুষ সাধারণত আহাম্মক হয়, সব খুলে না বললে কিছু বোঝানো যায় না তাদের।'

এর মধ্যেও না হেসে পারল না মাসুদ রানা। 'দেখো, ফয়েজ, তুমি কিন্তু আমাকেও...'

'না না, মাসুদ ভাই! তোবা!' আধ হাত জিভ বের করল ফয়েজ। 'আমি ছয় ফুটের ওপরে লম্বা যারা, তাদের মীন করেছি কেবল।'

আরেকবার আগুন ঝরা চোখে তাকে দেখল বিল্লাহ্, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল ঝট করে। 'ব্যাটা নাটকু!' বিড় বিড় করে বলল সে। 'পয়গম্বরের শত্রু!'

'স্বাভাবিক আচরণ করো সবাই। গল্প করো, অন্যদের মত শব্দ করে হাসাহাসি করো।' পায়ে পায়ে সামনের দিকের একটা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। বাইরে তাকাল। দুটোরই হেডলাইট জ্বলছে দেখা গেল, তবে ডীপ করা। একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় এল চট্ করে। তাড়াতাড়ি ওদের কাছে ফিরে এল রানা। 'কয়েন আছে তোমাদের কারও কাছে?'

'আছে।' পকেটে হাত ভরে দিল ফয়েজ। 'কেন?'

'বলছি। বের করো আগে। তুমি আর বিল্লাহ এখানে থাকো, আমরা দু'জন কিছুক্ষণের জন্যে পিছনদিকে যাচ্ছি। আমি আর নাদিরা।'

'কেন?' জানতে চাইল নাদিরা। 'পিছনে কি?'

ফয়েজের বাড়িয়ে ধরা কয়েনগুলো নিল মাসুদ রানা। নাদিরার দিকে ফিরল। 'ওখান থেকে টেলিফোন করবে তুমি ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে। বুদের দরজা বন্ধ করে চেঁচাবে মনের সুখে, কাঁদবে, ফোঁপাবে। ওদের বলবে, আগুন লেগে গেছে গেম ককে,

ভেতরের লোকজন সব আটকা পড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আগুন নেভানো সম্ভব না হলে একজনও বাঁচবে না। পরিষ্কার?'

মাথা দোলাল বিস্মিত মেয়েটি। 'তাতে লাভ?'

'অপেক্ষা করো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। অভিনয়টা নিখুঁত হতে হবে, মনে রেখো।'

'তা হবে,' অবিশ্বাসের সাথে বলল নাদিরা।

মাথা দোলাল রানা। 'আমি জানি হবে। ওটাই আমাদের একমাত্র চান্স এখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার। আমি অন্য ফোনে পুলিস ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলব একই সময়ে। ওদের জানাব, গেম ককে ডাকাত পড়েছে, মারপিট, লুটপাট চালাচ্ছে তারা। যদি আমাদের অভিনয় কাঁচা না হয়, আশা করা যায় পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে এ জায়গা নিউ ইয়ার'স ডে-র টাইমস স্কোয়্যারের মত জনারণ্য হয়ে উঠবে। এবং সুযোগটা নেব আমরা। বিল্লাহ, ফয়েজ এখানে অপেক্ষা করো। আরেক রাউণ্ড অর্ডার দাও কফির। চলো,' নাদিরার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। কথা বলতে বলতে, হাসতে হাসতে।'

পা চালাল নাদিরা। রানা থাকল পিছনে। ক্রমাগত কথা বলছে মেয়েটি, ঘন ঘন ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাচ্ছে, হাসছে। পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে যেন একেবারেই উদাসীন। কিচেন অতিক্রম করল ওরা, পিছনের হলরূমে চলে এল। পুরোপুরি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে আসামাত্র চেহারা পাল্টে গেল দু'জনেরই। দ্রুত পায়ে পুরানো ধাঁচের কাঠের তৈরি প্রথম বুদের সামনে এসে দাঁড়াল। এই সময় নোটিসটা চোখে পড়ল ওদের। ওটার দরজার হাতলে ঝুলছে 'আউট অভ অর্ডার' সাইন।

থমকে গেল রানা মুহূর্তের জন্যে। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, 'ওটায় চলো। দুটো ফোন একই সাথে করতে চেয়েছিলাম,' পরের বাক্য

আনমনে বলল ও। 'তুমি আগে, ঢোকো ভেতরে। খেয়াল রেখো, ওরা যেন ফাঁকি টের না পায়। নাম জানতে চাইলে যা খুশি একটা বলে দিয়ো। ঢোকো। আমি আছি এখানেই।'

মেয়েটিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল মাসুদ রানা। কাঁপা, ঘামে ভেজা পিচ্ছিল হাতে কয়েন পটে ফেলল নাদিরা, ডায়াল করল অপারেটরের নাম্বারে। রিং বাজতে শুরু করেছে ও-প্রান্তে, চতুর্থ দফা বাজার আগে রিসিভার তুলল অপারেটর।

'ইয়েস! কি সাহায্যে লাগতে পারি...'

'ফায়ার ডিপার্টমেন্ট!' ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত রোগীর মত চেঁচিয়ে উঠল নাদিরা তারস্বরে। 'এমার্জেন্সি! ওহ্ গড! ফায়ার ডিপার্টমেন্টে দিন! হারি আপ, প্লীজ! হারি আপ!'

'জাস্ট আ মোমেন্ট,' দ্রুত বলল অপারেটর। 'দিচ্ছি লাইন।'

খুট করে আওয়াজ উঠল ও মাথায়, পরমুহূর্তে মোটা একটা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। 'দিস ইজ...'

'আগুন!' গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচাল নাদিরা। 'আগুন! আগুন!! হায় খোদা, আমরা আটকা পড়ে গেছি! সব পুড়ে গেল! সব জ্বলে ছাই...'

'কোথায়?' হুঙ্কার ছাড়ল ও-প্রান্তের পুরুষ কণ্ঠ। 'কোত্থেকে বলছেন আপনি?'

'র-র-রকি মাউন্ট! গেম কক ট্যাভার্ন থেকে, রুট নাইন্টি ফাইভের কাছে। ওহ্ গড! হারি আপ, প্লীজ। পুরো রেস্টুরেন্ট জ্বলছে, মানুষজন সব...'

'কে বলছেন! কি নাম আপনার?'

'প্লীজ, হারি আপ!'

'কি নাম আপনার?' এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, মনে

হলো সে-ও আচমকা আক্রান্ত হয়েছে ধনুষ্টংকারে।

‘বি-বিয়া, বিয়া ফ্ল্যাগুার্স! প্লী-ই-জ...’

‘অল রাইট, লেডি! ডোন্ট প্যানিক, আমরা আসছি।’ কেটে গেল লাইন।

‘চমৎকার!’ হাসল মাসুদ রানা। ‘ভাবতেই পারিনি এত ভাল অভিনয় করতে পারো তুমি।’

বেরিয়ে এল নাদিরা ভেতর থেকে। ফ্যাকাসে মুখে হাসল। ‘কি জানি কতদূর বিশ্বাস করেছে ওরা। বলল তো আসছি। যদি...’

‘কোন যদি-টদি নেই। এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে ওরা। সরো, এবার আমি একটু অভিনয় করি।’ ভেতরে ঢুকল ও। দরজা বন্ধ করল না, কারণ পিছনের খোলা দরজার ওপর নজর রাখতে হবে। অপারেটরের মাধ্যমে ত্রিশ সেকেণ্ডের ভেতর পিডিতে পৌঁছে গেল রানার কল।

‘শুনুন,’ মাউথপীসের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে চাপা অথচ জরুরী কণ্ঠে দ্রুত বলতে লাগল রানা। ‘জোরে কথা বলতে পারছি না, কেউ শুনে ফেলতে পারে। তিনজন অস্ত্রধারী ডাকাত...’

‘ডাকাত!’

‘হ্যাঁ, বলতে দিন। তিনজন ডাকাত জিম্মি করে রেখেছে রেস্তোরাঁর শ’খানেক খদ্দেরকে। লুটপাট চালাচ্ছে, মারধোর করছে।’

‘কোথায়?’ তড়পে উঠল পিডির কল গ্রহণকারী। ‘কোন রেস্তোরাঁ?’

নাম-ঠিকানা জানাল মাসুদ রানা। ‘চেনেন তো?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই চিনি!’

‘গুড। কাস্টমারদের সবাইকে সার বেঁধে দাঁড়াতে বাধ্য করছে ওরা, ওহ্ মাই গড! তাড়াতাড়ি আসুন, খুন-খারাপি ঘটে যেতে

পারে যে কোন মুহূর্তে। অ্যাঁ? আমার নাম জ্যাক, জ্যাক ফ্লেমিং। প্লীজ, ফর গডস সেক, জলদি আসুন! কুইক, কুইক!' রিসিভার ঝুলিয়ে রাখল মাসুদ রানা।

বেরিয়ে এল বুদ থেকে। 'কেমন করলাম?'

'আমার থেকে অনেক ভাল। এবার?'

'একটু অপেক্ষা করো। পিছনে শ্রীমানদের কয়জন আছে দেখা দরকার।' হলের এ মাথায় চলে এল মাসুদ রানা। মনে পড়েছে, বাথরুমের পিছনের দেয়ালে বাতাস চলাচলের জন্যে খুদে একটা জানালা দেখেছে ও তখন। কফিনের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। দরজা বন্ধ করতে সাহস হলো না। তাই ভিড়িয়ে দিয়ে চট করে উঠে দাঁড়াল কমোডের ওপর। সাবধানে উঁকি দিল পিছন দিকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটোর ওপর চোখ পড়ল রানার।

গ্রেটকোটের পকেটে দু'হাত ভরে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। নজর গেম ককের ব্যাক এন্ট্রান্সে সেঁটে আছে। দু'জনই, না আরও আছে? ভাবতে ভাবতে নেমে পড়ল রানা। দ্রুত হাতে ওয়ালথারের নলে সাইলেন্সার জুড়ে নিয়ে পকেটে ভরল অস্ত্রটা। বেরিয়ে এল।

'আছে কেউ?' কাছে এসে প্রশ্ন করল নাদিরা।

'অবশ্যই! দু'জনকে দেখতে পেয়েছি। আরও আছে কি না কে জানে। চলো, ভেতরে যাওয়া যাক।'

আগের মতই হাসি মুখে কথা বলতে বলতে ফিরে এল ওরা বারের সামনে। 'কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে নিশ্চই?' ফয়েজের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'না। একটু আগেই দিয়ে গেল, বেশ গরম আছে এখনও।'

'দেখি!' নিজের কাপে চুমুক দিল ও। মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে। 'হ্যাঁ, চলবে।' আরও দশ ডলার ধরিয়ে দিল টেণ্ডারের

হাতে। দ্বিতীয় ওয়েট্রেস কাছেই ছিল, তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'টিপ্স্ পুরোটা একাই গাপ্ করে দিয়ো না। অর্ধেকটা ওকে দাও।'

'রাইট, স্যার। হোয়াই নট?'

নিজের অংশ পকেটে পুরে হাসল মেয়েটি রানার দিকে তাকিয়ে। 'থ্যাঙ্কস।'

'নো মেনশন, হানি।'

'কি অবস্থা, মাসুদ ভাই?' ওর গায়ের সঙ্গে লেগে দাঁড়াল বিল্লাহ। বিড় বিড় করে বলল, 'হয়েছে কাজ?'

'হয়েছে।'

'ওরা আসছে?'

'যে-কোন মুহূর্তে সাইরেন শুনতে পাবে ওদের।'

'যাক।'

পিছনের দু'জনের কথা ওদের জানাল মাসুদ রানা। 'আচ্ছা!' বড়সড় মাথাটা দোলাতে লাগল পাহাড় ঘন ঘন। 'ও দুটোকে আমি নেব, মাসুদ ভাই।'

শুনেও না শোনার ভান করল রানা। 'আগে কফি শেষ করো। তারপর বলছি আমি কাকে কি করতে হবে।'

নির্দেশ শোনার গরজ বেশি, তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট কফি একবারে গলায় ঢেলে দিল বিল্লাহ ও ফয়েজ। 'বলুন।' রানার আরেকদিক ঘেঁষে দাঁড়াল ফয়েজ আহমেদ।

'সাইরেনের আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র একজন একজন করে বাথরূমে যাবে তোমরা, ভেতরে ঢুকে পিস্তলে সাইলেন্সার লাগিয়ে আবার ফিরে আসবে এখানে। খুব দ্রুত।'

'এলাম,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মধ্যমার নখ খুঁটছে ফয়েজ। 'তারপর?'

‘প্রথমে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের গাড়ি আসবে। আশা করা যায় তার মিনিট খানেকের মধ্যেই পৌঁছবে পুলিস। যদি এক সাথে এসে পড়ে, তাহলে তো দারুণ হয়। যাই হোক, যে দলই আগে আসুক, ওদের গাড়ির বহর পার্কিং লটে প্রবেশ করামাত্র পিছন দিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা। বিনা কারণে হঠাৎ করে ওদের আগমনে নিশ্চই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে রবার্টো আর তার সঙ্গীরা, সে সুযোগটা কাজে লাগাব আমরা। পিছনের ওরা কোথায় আছে আমরা জানি, কিন্তু ওরা জানে না ঠিক কখন বের হব আমরা, এবং পিছন দিয়েই বের হব কি না। অর্থাৎ ওদের থেকে অনেক সুবিধেজনক পর্যায়ে আছি আমরা।

‘ওদের ফায়ার এবং পুলিস, পর পর দুটো চমক উপহার দিতে যাচ্ছি আমরা, ওরা যখন করণীয় সম্পর্কে দ্বিধান্বিত থাকবে, সেই মুহূর্তে তৃতীয় চমকটা উপহার দিয়ে বেরিয়ে পড়ব সবাই। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো থাকছে। কাজেই প্রয়োজনে ওদের দু’চারজনকে নিঃশব্দে ঠাণ্ডা করে দেয়ার সুযোগটাও আমরা ষোলো আনা পাচ্ছি। আমি জানি, কাজটা খুব সহজেই সারতে পারব আমরা, ওরা ব্যাপার টের পাওয়ার আগেই হাওয়া হয়ে যেতে পারব এখান থেকে।

‘প্রথমে বের হব আমি।’ বিল্লাহ কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল মাসুদ রানা। ‘রাখো। আমিই একমাত্র জানি ঠিক কোথায় রয়েছে পিছনের দু’জন। কাজেই, আমি যাচ্ছি প্রথম। এ-ব্যাপারে নো আরগুমেন্ট। আমার পর ফয়েজ, তারপর নাদিরা। সবশেষে বিল্লাহ তুমি। আমি আর তুমি পিছনের ওদের সামলাব। এই ফাঁকে ফয়েজ নাদিরাকে নিয়ে বাউণ্ডারি ওয়াল ঘেঁষে সামনের পার্কিং লটের দিকে এগোবে। আশা করছি, ততক্ষণে সামনে গাড়ি আর মানুষের হাট বসে যাবে।’

‘এবং লেজুড় ভাইয়েরাও লেজে-গোবরে একাকার দেখে সটকে পড়বে!’ উল্লাস প্রকাশ পেল ফয়েজের কণ্ঠে। ‘সব পুলিস নিউ ইয়র্কের পুলিস নয় যে ওদের মত...’ থেমে গেল সে।

প্রতীক্ষায় ছিল ওরা, তাই আওয়াজটাও ওদেরই কানে এল প্রথম। খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে টানা সাইরেনের আওয়াজ। অনেকগুলো।

‘সামনে ভিড়ের ভেতর ছোটাছুটি করবে না কেউ ভুলেও,’ বলল মাসুদ রানা। উত্তেজনায় মৃদু কাঁপুনি উঠে গেছে ওর বুকে। ‘ধীরেসুস্থে গিয়ে গাড়িতে উঠবে। বিল্লাহ গাড়ি চালাবে। খুব সাবধানে বেরুতে হবে। পুলিস বা ফায়ারের কোন গাড়ির সঙ্গে টক্কর লাগলেই সর্বনাশ। বেরিয়ে সোজা রুট নাইন্টি ফাইভে উঠবে, তারপর সোজা দক্ষিণে ভাগবে, যত জোরে সম্ভব। সবাই বুঝতে পেরেছ সব? কারও কোন প্রশ্ন?’

কেউ মুখ খুলল না। ওদিকে আওয়াজ অনেক কাছে এসে পড়েছে সাইরেনের। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে অনেকগুলো ফায়ার ফাইটার।

‘ভেরি গুড।’ ধীর পায়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল মাসুদ রানা। বাইরে তাকাল। ডান দিকে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে লাল আলোর বেশ কয়েকটা ঝলকানি চোখে পড়ল ওর। আকাশের রংও লাল হয়ে গেছে। ফাইটারগুলোর টানা চিৎকার ছাপিয়ে দূর থেকে আরও একটা আওয়াজও শুনতে পেল এবার মাসুদ রানা। বাফেলো হুইস্‌ল–এসে গেছে পুলিসও। প্রথম দলের বড়জোর আধ মিনিট পিছনে আছে ওরা।

চমৎকার! খুশি হয়ে উঠল মাসুদ রানা। দলের মধ্যে ফিরে এল। ‘দুই বাহিনীই হাজির।’

ওদিকে সাইরেনের আওয়াজ যত এগিয়ে আসছে, ততই ঘন

ঘন গেম ককের দরজার দিকে তাকাচ্ছে খদ্দেররা। আলোচনা, খাওয়া-দাওয়ায় আপনাআপনি ছেদ পড়ে গেছে তাদের। কয়েকজন দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে উঠে পড়ল আসন ছেড়ে, পা বাড়াল বাইরে গিয়ে কি ঘটেছে দেখবে বলে। কেউ একজন দরজা খুলল, পরমুহূর্তে সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানের পর্দায় ভীষণ জোরে আঘাত করল ভেতরের সবার।

চোখের কোণে লাল একটা ফ্ল্যাশ চোখে পড়ল মাসুদ রানার, পরক্ষণেই হুশ করে সামনের লটে ঢুকে পড়ল প্রথম ফায়ার ফাইটার ট্রাক। কড়া ব্রেক কষে একরাশ নুড়িপাথর ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা একেবারে গেম ককের প্রবেশ পথের সামনে। ওটার পর পরই ঢুকল আরও তিনটে ট্রাক। পুরোপুরি থেমে দাঁড়ানোর আগেই ওগুলো থেকে বাঁদরের মত লাফিয়ে লাফিয়ে নামল কয়েক ডজন ফায়ার ম্যান। পাম্পার, হোস কার্ট, খাটো খাটো হুক ল্যাডার, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, হুক-পোল, কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি শুরু করল লোকগুলো।

হৈ-চৈ, চিৎকার, গলা ফাটানো নির্দেশ, সব মিলিয়ে মুহূর্তে নরক গুলজার হয়ে উঠল। ব্যাপার দেখে পুরো হতভম্ব হয়ে গেছে গেম ককের প্রত্যেকে। বার ফেলে সামনের দিকে ছুটল টেণ্ডার পড়িমরি করে। তার পিছন পিছন বাকি খদ্দেররাও ছুটল। পলকে খালি হয়ে গেল গেম কক।

সব শেষে ভেতরে ঢুকল ফায়ার চীফের কার। এবং তার পিছনেই পুলিসের অসংখ্য স্কোয়াড কার। সবার একসঙ্গে ছোটাছুটি, হুড়োহুড়ি মিলিয়ে অবর্ণনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলো সামনে।

'এইবার!' দ্রুত পিছন দিকে এগোতে আরম্ভ করল মাসুদ রানা। অন্যেরা অনুসরণ করল ওকে। খোলা দরজাটার সামনে

এসে থেমে দাঁড়াল রানা, ওয়ালথার বাগিয়ে সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। জায়গাটা খালি দেখল ও, নেই কেউ। খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ভাল করে তাকাল বাইরে। না, সত্যিই কেউ নেই। একদম ফাঁকা গেম ককের ব্যাক ইয়ার্ড।

'এসো!' বলে পা বাড়াল রানা বাউণ্ডারি ওয়ালের দিকে। এক মিনিটের মধ্যে নিরাপদেই ভিড় ঠেলে গাড়িতে এসে উঠল ওরা। বিনা বাধায় গাড়ি নিয়ে উঠে এল বড় রাস্তায়। রবার্টো বা তার সঙ্গী-সাথী কারও টিকিরও দেখা পেল না ওরা কেউ।

চার

আবছা অন্ধকার ভেদ করে তীরবেগে ছুটছে বুইক রিভেরা। ভেতরে চুপ করে বসে আছে ওরা, কারও মুখে কথা নেই। মারাত্মক সংঘাতে জড়িয়ে পড়া থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে, কিন্তু তাই নিয়ে ওদের কোন আনন্দ উচ্ছ্বাস নেই। সবাই গম্ভীর। ডুবে আছে যার যার চিন্তায়। এবারের মত বেঁচে যাওয়া মানে যে বরাবরের মত বেঁচে যাওয়া নয়, তা ওরা ভালই বোঝে।

'আরেকটু আস্তে করো, বিল্লাহ,' বলল মাসুদ রানা। 'ষাটের ওপর যেয়ো না, হাইওয়ে পেট্রোল ধরে ফেলতে পারে।'

গতি কমাল বিল্লাহ। মাইল মিটারের নিড্ল্ পঁচাত্তর থেকে ষাটে নেমে এল বুইকের। মিডল লেনে নিয়ে এল সে গাড়ি। রাত বাজে একটা, অথচ ট্রাফিকের অবস্থা দেখে মনে হয় সবে বুঝি দুপুর।

'দেশের সবাই কি আমাদের মত মায়ামি যাচ্ছে নাকি?' আনমনে অনেকটা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল নাদিরা।

কেউ কোন উত্তর দিল না। ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটি এক সময়। ‘সুযোগ থাকার পরও বুইকের বুট ভাঙেনি রবার্টো,’ বলল রানা চিন্তিত গলায়। ‘প্রচুর সময় পেয়েও মালগুলো নেয়নি। এর অর্থ কি, ফয়েজ?’

‘আমাদের গাড়ি কোনটা জানতো না সে, মাসুদ ভাই। শুধু আমরা গেম ককে আছি খবর পেয়েই ছুটে এসেছে।’

‘ওকে দিল কে খবরটা?’ বলল বিল্লাহ।

‘খুব সম্ভব বারটেণ্ডার,’ বলল মাসুদ রানা। ‘তোমরা কেউ দেখেছ ওকে বারের ফোন থেকে কল করতে? অথবা পিছনের বুদের দিকে যেতে?’

‘আমি দেখিনি।’

‘আমিও না।’

‘সমস্যায় পড়ে গেলাম।’ সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

‘কি সমস্যা?’ বলল ফয়েজ।

‘এখন যেখানেই যাব সেখানেই এমনি তাড়া খেতে হবে আমাদের।’

‘কেন?’

‘তিনজন পুরুষ আর একজন মেয়ে একসঙ্গে জার্নি করছে দেখলেই সংবাদটা কেউ না কেউ পৌঁছে দেবে রবার্টোকে। সে নিশ্চই হাইওয়ের যত রেস্তোরাঁ, বার, ট্যাভার্ন, মোটেল, রোডহাউস ইত্যাদি আছে, সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, যে আমাদের খবর ওকে জানাতে পারবে, তাকে মোটা বকশিশ দেবে সে। ওদের সঙ্গে মাফিয়ার নিজস্ব চর বাহিনীও আছে। সবাইকে বলে রেখেছে ওরা, এরকম কোন গ্রুপ দেখলে এই নাম্বারে কল করবেন, অথবা তাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। গেম ককে ওরা আমাদের গাড়ি চিনতে পারেনি ঠিকই,

তবে এখন চেনে। আমরা বেরিয়ে আসার সময় গাড়িটা ওদের কেউ না কেউ নিশ্চই দেখেছে।'

'আমার মনে হয় না, মাসুদ ভাই,' বলে উঠল মুত্তাকিম বিল্লাহ। 'বেরিয়ে আসার সময় ভাল করে লক্ষ করেছি আমি, ওদের গাড়ি দেখতে পাইনি। মনে হয় ঝামেলা টের পেয়ে আগেই সরে পড়েছে ব্যাটারা।'

'হ্যাঁ, আমিও লক্ষ করেছি,' বলল রানা। 'ছিল না গাড়ি দুটো। আর পিছনের দুই পাণ্ডা তো ছিলই না।' কিছু সময় চুপ করে থাকল ও, ভাবল কিছু। 'কেউ না দেখে থাকলে তো ভালই। আয়ু কিছুটা বাড়ল বুইকের।'

'কেউ দেখেনি আমাদের, শিওর ।' মাথা দোলাল ফয়েজ আহমেদ। 'যা পরিস্থিতি হয়েছিল! গণ্ডাগণ্ডা ফায়ার এঞ্জিন, পুলিসের গাড়ি, ওদের আর খদ্দেরদের উল্টোপাল্টা দৌড়-ঝাঁপ, তার ওপর অন্ধকার, দেখতে পাওয়ার প্রশ্নই আসে না।'

'যাক,' ফোঁস করে দম ছাড়ল বিল্লাহ। 'তাও ভাল। ডিলার ভায়া অন্তত কুকাজটা করেনি। তার মানে এখনই এটা ত্যাগ না করলেও চলবে।'

'ঠিক,' মাথা দুলিয়ে সায় জানাল ফয়েজ। 'কি বলেন, মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ। প্রার্থনা করি তোমাদের ধারণা যেন সত্যি হয়।'

মিনিট পনেরো নীরবে এগোল ওরা। একটু একটু করে কমে আসতে শুরু করেছে ট্রাফিক। ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। দুটো বাজতে চলেছে। 'বিল্লাহ্, সামনের টার্নঅফে গাড়ি ঘোরাও,' বলল ও। 'র‍্যালে ফিরে যাব আমরা। রাতটা ওখানে কাটিয়ে কাল আবার রওনা হব।'

'জ্বি,' একান্ত বাধ্যগতের মত বলল পাহাড়।

উইলসন পৌঁছে বুইক ঘোরাল সে, ফেডারেল হাইওয়ে টু সিক্সটি ফোর ধরে ফিরে চলল পশ্চিমে। র‍্যালের উপকণ্ঠে একটা অপরিচ্ছন্ন মোটেলে উঠল ওরা। অন্যান্যবারের মত দুটো ডবল রূম নিল। পালা করে ঘুমাল ওরা পরদিন প্রায় দুপুর পর্যন্ত। তারপর গোসল এবং পেট পুরে নাস্তা খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল।

'আমি বাইরে যাচ্ছি কিছুক্ষণের জন্যে,' একটার দিকে ঘোষণা করল মাসুদ রানা। 'জরুরী কিছু কেনাকাটা আছে। গাড়ি রইল। বিল্লাহ, ফয়েজ, সতর্ক থেকো। বিপদ দেখলে সটকে পড়বে নাদিরাকে নিয়ে।'

'জ্বি।'

'কি কেনাকাটা করতে হবে?' জানতে চাইল নাদিরা।

উত্তরটা এড়িয়ে গেল মাসুদ রানা। 'তোমার কিছু লাগবে?'

'না।' মাথা দোলাল মেয়েটি। 'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'নির্বিঘ্নে কাটানো গেলে দিনে বেরুচ্ছি না। রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে বের হব।'

'কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে আমাদের যদি পালাতে হয়?' পরিষ্কার উদ্বেগ প্রকাশ পেল নাদিরার কণ্ঠে। 'যদি...যদি...'

'ভয় নেই। এতক্ষণেও যখন কিছু ঘটেনি সেরকম, আর ঘটবে বলে মনে হয় না। যদি ঘটেই যায়, ঘাবড়িয়ো না। এদের দু'জনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত রবার্টোর সাধ্য নেই তোমাকে স্পর্শ করে।'

'কিন্তু যদি পালাতেই হয়, তোমার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হবে কি ভাবে?'

মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। 'ওরা জানে কি ভাবে যোগাযোগ করতে হবে। ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগতে হবে না তোমাকে। খেয়ে-দেয়ে আরেক দফা ঘুম দাও, নয়তো টিভি

দেখো, ওদের সঙ্গে গল্প করো তবে চেষ্টা কোরো রূম থেকে না বেরুতে। বেশি সময় লাগবে না আমার। পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসব।'

'যদি দেরি হয়ে যায় আপনার?' বলল ফয়েজ। 'আমি বা বিল্লাহ আসব খোঁজ নিতে?'

'না।' অকস্মাৎ বন্ধুসুলভ সুর উধাও হয়ে গেল মাসুদ রানার কণ্ঠ থেকে, কর্তৃত্বের ভরাট সুর ফুটল সেখানে। 'কাউকে আসতে হবে না। সোজা সরে পড়বে তোমরা একে নিয়ে। পরিষ্কার?'

দু'জনেই মাথা নাড়ল ওরা। নীরবে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। রূমের দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল নাদিরা। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। নানার কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর কষ্টার্জিত সংগ্রহের কথা, সাফাত সিটিতে ওদের স্বপ্নের মত সুন্দর বাড়িটার কথা। কোত্থেকে কি হয়ে গেল ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল নাদিরা।

নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন ছেড়ে কী করে নিজেকে এমন জটিল এক পরিস্থিতিতে জড়াল, ভেবে অবাক লাগল নিজেরই। সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে আরও কয়েকজনকে। ওরই সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তাদের ভাগ্য। দুটো তরতাজা প্রাণ এরই মধ্যে ঝরে গেছে নাদিরাকে সাহায্য করতে গিয়ে। আরও যদি কেউ...। চট করে উঠে বসল ও, মাথা থেকে দূর করে দিল আজেবাজে চিন্তা। কিছুক্ষণ টিভিতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা চালাল। কিন্তু কাজ হলো না।

সকার গেম চলছে টিভিতে। এই খেলাটা একদম সহ্য করতে পারে না ও। ঢোলের মত প্যাডেড জার্সি আর গ্রিল লাগানো হেলমেট পরে মাঠ জুড়ে ষাঁড়ের মত কাঁধ দিয়ে গুঁতোগুঁতি, যাচ্ছে তাই! টিভি অফ করে দিল নাদিরা। দুটোর দিকে রূমে আনিয়ে

লাঞ্চ খেলো ওরা। কথাবার্তা তেমন একটা বলল না কেউ। সবাই ডুবে আছে নিজের নিজের ভাবনায়।

ঘড়ির কাঁটা ঠিকই চলছে, তবু ওদের মনে হচ্ছে সময় যেন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, পণ করেছে নড়বে না। তিনটে বাজল, তার এক যুগ পর চারটা। নানান দুশ্চিন্তা কাহিল করে ফেলেছে নাদিরাকে। ওর কেবলই মনে হচ্ছে একা রানাকে যেতে দেয়া মোটেই উচিত হয়নি। জোর করে হলেও বিল্লাহ বা ফয়েজ, একজনকে সঙ্গে দেয়া উচিত ছিল। ও যদি জেদ ধরে বসত, একজনকে সঙ্গে না নিয়ে পারত না রানা কিছুতেই। ভুল হয়ে গেছে, বড্ডো ভুল হয়ে গেছে।

কাঁটা যতই পাঁচটার দিকে এগোচ্ছে, ততই আতঙ্কিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে নাদিরা। কি হবে যদি মাসুদ রানা ফিরে না আসে? যদি ধরা পড়ে গিয়ে থাকে ও রবার্টো গার্সিয়ার হাতে? যদি...। ছোটখাট একটা লাফ দিল নাদিরার কলজেটা, গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে একটা ট্যাক্সি। পরক্ষণেই গভীর স্বস্তি ও প্রশান্তির একটা ঝিরঝিরে ধারা͏়ান করিয়ে দিয়ে গেল নাদিরাকে, ওটার পিছনের সীটে মাসুদ রানাকে দেখেছে সে। পাঁচটা বাজতে তখন দশ মিনিট বাকি।

হাতে বড়সড় একটা প্যাকেট নিয়ে ভেতরে ঢুকল মাসুদ রানা। নাদিরার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা ফুটল না ঠিকমত। ফ্যাকাসে লাগছে ওকে, কপাল চিক চিক করছে ঘামে। মনের মধ্যে বিপদের ডঙ্কা বেজে উঠল নাদিরার। 'কি হয়েছে, রানা?'

উত্তর না দিয়ে বিল্লাহর দিকে ফিরল রানা। 'সব ঠিকঠাক?'

'জ্বি, সব ঠিক।'

'বাঁচলাম! চলো, বেরিয়ে পড়ি। এখনই।'

‘কি হয়েছে, মাসুদ ভাই?’ জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ।

একটা আর্ম চেয়ারে বসে পড়ল মাসুদ রানা। কপালের ঘাম মুছল। ‘ওকে দেখতে পেয়েছি আমি। রবার্টোকে। দলবল নিয়ে পৌঁছে গেছে। ভয় হচ্ছিল, এখানকার খোঁজ পেয়েই এসেছে ভেবে।’

‘ও আপনাকে দেখেনি তো?’

‘না।’

‘কতজন আছে রবার্টোর সাথে?’

‘মোট আটজন।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেল ত্যাগ করল ওরা। বেরিয়ে পড়ল বুইক নিয়ে। মাসুদ রানা বসেছে সামনের প্যাসেঞ্জার’স সীটে, ড্রাইভ করছে ফয়েজ আহমেদ। রিয়ার ভিউ মিরর নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে রানা যাতে পিছনে ভাল করে নজর রাখা যায়। থেকে থেকে চোখ তুলছে ও, সন্দেহজনক কোন গাড়ি পিছু লেগেছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে।

স্মিথ ফিল্ডের ওপর দিয়ে এসে আবার রুট নাইন্টি ফাইভে উঠল বুইক। দক্ষিণ দিকে নাক সই করে ছুটল নিক্ষিপ্ত তীরের মত। ম্যাপ দেখে ফয়েজকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে মাসুদ রানা। ওর ‘ডানে যাও’ বা ‘বাঁয়ে যাও’ শব্দ ছাড়া আর কারও গলা শোনা যাচ্ছে না। মুখে তালা চাবি মেরে বসে আছে সবাই।

দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সামনে-পিছনে যতদূর চোখ যায় কেবল গাড়ি আর গাড়ি। পিঁপড়ের মত পিল পিল করছে হাইওয়েতে। কত যে বাহারি রঙের আর আকারের–মডেলের, বলে বোঝানো মুশকিল। সংখ্যায় ওগুলো অনেক বলেই বেশি বেশি মন খুঁত খুঁত করছে মাসুদ রানার। দশ-পনেরো, কি বিশ-পঁচিশটা গাড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে যে

ওদের অনুসরণ করছে না রবার্টো গার্সিয়া কে বলতে পারে?

সন্ধে গড়িয়ে গেল। ফিয়েটিভিল হয়ে লাম্বার্টনের দিকে চলেছে ওরা। ট্রাফিকের চাপ এর মধ্যে আরও বহু গুণ বেড়ে গেছে। দেড় ঘণ্টার পথ অতিক্রম করতে পুরো তিনটি ঘণ্টা ব্যয় হলো ওদের। ফেয়ারমন্ট পৌঁছে হাইওয়ে ছেড়ে ব্রাঞ্চ রোডে গাড়ি ঢোকাল ফয়েজ। দ্রুত ডিনার খেলো ওরা এখানে, তারপর আবার দৌড়। ড্যাশ বোর্ডের মৃদু আভায় ম্যাপ দেখে পথের নির্দেশ জানাতে থাকল রানা ফয়েজকে। আধঘণ্টা নীরবে এগোল ওরা।

'র‍্যালেতে কি এত কিনলে, রানা?' জানতে চাইল নাদিরা। এত পথ পেরিয়ে এসে এই প্রথম মুখ খুলল সে।

ম্যাপটা ভাঁজ করে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ভরে রাখল মাসুদ রানা। আসনের ওপর পাশ ফিরে বসল, যাতে ওর মুখটা দেখতে পায় মেয়েটি। 'অনেক কিছু,' বলল ও। 'ওয়্যার ক্লিপার্স, লং-নোজড প্লায়ার্স, অল নামের এক ধরনের বিশেষ সূচ, একটা বিশেষ ডিজলভেন্ট, বল-পিন হ্যামার, আরও অনেক কিছু।'

বিস্ময় ফুটল মেয়েটির মুখে। 'কি ওগুলো! কি কাজে লাগবে?'

'অলঙ্কারগুলো ভাংতে।'

'যেমন?'

'ওগুলো ভেঙে পাথর আর সোনা আলাদা করব ঠিক করেছি। তাতে বোঝা অনেক কমে যাবে আমাদের। ঝামেলা কমবে।'

'ওসব করতে গেলে জিনিস নষ্ট হবে না?'

'না। সতর্ক হয়ে করলে কিছুই নষ্ট হবে না। বরং সুবিধেই হবে। সেটিং ভেঙে ফেললে ওগুলো বিক্রি করা কোন সমস্যা হবে না। একটা অলঙ্কার সেটে যখন একটা পাথর বসানো থাকে, তখন জানা থাকলে চেনা যায়। কিন্তু স্রেফ একটা পাথর বা এক

তাল গলানো সোনা চেনার কোন উপায় নেই।’

ভেতরের জমাট বাঁধা ভারি পরিবেশ খানিকটা তরল হলো। একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠতে শুরু করল আবার সবাই। এ মুহূর্তে সাউথ ক্যারোলিনায় আছে ওরা। বুইকের চাকার তলায় মরা সাপের মত নির্জীব পড়ে থাকা প্রশস্ত হাইওয়ে সাঁই সাঁই করে দ্রুত পিছিয়ে চলেছে। শীতে বাষ্প জমছে গাড়ির কাঁচে, কিছুক্ষণ পর পর ওয়াইপার চালিয়ে সামনেটা পরিষ্কার করতে হচ্ছে।

আচ্ছন্নের মত হেলান দিয়ে বসে আছে নাদিরা। ওর মনে হচ্ছে এ পথের বুঝি অন্ত নেই। কেউ যদি বলে দুনিয়ার আরেক মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই হাইওয়ে, এবং পরবর্তী স্টপেজ হংকং, নির্দ্বিধায় মেনে নেবে সে। একই গতিতে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলেছে বুইক। ক্রমশ যৌবনে পৌঁছল রাত, তারপর প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্ধক্যের দিকে পা বাড়াল, তবু বিরাম নেই চলার। দূরে, অনেক সময় পর পর, ছোট-বড় শহরের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে ওরা আকাশে নিয়ন আলোর আভা দেখে।

ঘুম ঘুম আবেশ মাখা আধবোজা চোখে কেবল দেখেই চলেছে নাদিরা, আর অনুভব করার চেষ্টা করে চলেছে। আবার দেখেও দেখছে না, অনুভব করেও করছে না। পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থেকেও যেন নেই সে। দেহ থেকে আপন সত্তা যেন আলাদা হয়ে গেছে তার, নিজেকে এবং অন্যদের দেখছে দূর থেকে।

ফ্লোরেন্স, ম্যানিং, সামারটন পাশ কাটিয়ে লেক ম্যারিয়নের দিকে চলেছে ওরা এখন। বাজে প্রায় সাড়ে তিনটা। ‘ট্যাঙ্কে তেল আর কত আছে?’ জানতে চাইল মাসুদ রানা। মুখের সামনে হাত এনে হাই তুলল লম্বা করে।

‘তিন-চার লিটারের বেশি না,’ বলল ফয়েজ।

‘এবার তাহলে থামতে হয়। ভেবেছিলাম একবারে সাভান্না

গিয়ে বিশ্রাম নেব। তা আর হলো না। সামনের টার্নঅফে থামব আমরা, বিশ্রাম দরকার সবার।'

'ঠিক,' উঠে বসল নাদিরা। 'বিশ্রাম না নিলে আর একদম চলছে না। একবার বিছানায় পিঠ ঠেকালে এক সপ্তায়ও আমার ঘুম ভাঙবে কিনা সন্দেহ আছে।'

'ঠিক আছে,' বলল মাসুদ রানা। 'দেখা যাক, তেমন ভাল জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় কি না। পেলে দু'-এক দিন রেস্ট নেব আমরা, অবশ্য যদি রবার্টোর ধাওয়া খেতে না হয় এর মধ্যে।'

আরও পনেরো মিনিট পর পরবর্তী টার্নঅফে পৌঁছল ওরা। বুইক ঘুরিয়ে সেকেণ্ডারি রোডে ঢোকাল ফয়েজ। সামনে যে খুদে শহর পড়ল, তার নাম কুসাহোয়াচি। ইণ্ডিয়ানদের রাখা নাম খুব সম্ভব, ভাবল মাসুদ রানা, তাই শুনতে এরকম অদ্ভুত নাম। আধঘণ্টা ধরে ঘুমে বিভোর কুসাহোয়াচির বুক চষে ফিরল ওরা, কিন্তু হোটেল-মোটেল বা রোডহাউস, কোথাও ভ্যাক্যান্সি সাইন চোখে পড়ল না।

বিরক্ত হয়ে হাইওয়েতে ফিরে এল ওরা, ছুটল পরবর্তী শহরের উদ্দেশে। নাম তার রিজল্যাণ্ড। কিন্তু এখানেও সেই একই কাহিনী। পরের শহর হার্ডিভিল, জর্জিয়ার বর্ডারের আগের শহর। এখানে ভাগ্য দারুণভাবে সহায়তা করল ওদের। ছয় তলা এক নতুন হোটেলের চার তলায় স্থান পেল ওরা। সব ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা আছে এখানে। রূমে রূমে টিভি, খুদে রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি আছে। তাছাড়া হোটেলটা সেন্ট্রালি এয়ার কণ্ডিশণ্ড।

বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে এলিভেটরে চড়ল সবাই। কাপড় ছাড়ার কথা এমন কি ভাবল না পর্যন্ত কেউ, মাত্র দশ মিনিটে তলিয়ে গেল মরণ ঘুমে। ঘুম নেই কেবল মাসুদ

রানার চোখে। ওদের রুমের সামনের দিকের জানালা সোজা নিচে হোটেলের কার পার্ক। তাকালেই দেখা যায় বুইকটা। ধুলোর পুরু স্তর জমে আছে ওটার দেহে। একটা আর্ম চেয়ার এনে জানালার কাছে বসল ও, সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

ঘরের ওমাথায় নাক পর্যন্ত কম্বল টেনে মড়ার মত ঘুমাচ্ছে নাদিরা। অনড়। কালো কম্বলের পটভূমিতে ওর ফর্সা মুখের আভাস দেখা যায় অল্প অল্প। একটা শেষ করে আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। কার পার্ক এবং তার আশপাশের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নজর। দু'চোখের পাতা ভারি হয়ে এল ওর এক সময়, মেলে রাখতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ঘুম ঘুম একটা ভাব গ্রাস করে ফেলল মাসুদ রানাকে। অথচ ঘুম নয় সেটা, আবার জাগরণও নয়, অনেকটা জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে যেন রানা।

ভাবনা-চিন্তা পরিষ্কার নয়। একটা ভাবনা উদয় হয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে, ধরতে পারছে না ও। নাকেমুখে কড়া রোদের আঁচ টের পেয়ে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল মাসুদ রানা। চট্ করে চোখ বোলাল হাত ঘড়িতে–সোয়া নয়টা। ওরে বাবা! তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ও, পরক্ষণেই বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। একই ভঙ্গিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমানোর ফল, বিষ হয়ে গেছে পিঠ। নাদিরার বিছানা খালি দেখে চোখ কোঁচকাল রানা, বাথরুম থেকেও কোন শব্দ আসছে না। গেল কোথায় মেয়েটা?

জানালা দিয়ে নিচে তাকাল মাসুদ রানা। এক কণা ধুলোও লেগে নেই বুইকে, চকচক করছে ওটা। মনটা খুশি হয়ে উঠল ওর, নিশ্চই বিল্লাহ বা ফয়েজের কাজ। ট্যাঙ্কও হয়তো ফুল করে রেখেছে ওরা। সরে আসতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ করে নাদিরার ওপর চোখ পড়ল, একটা দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে সে,

হাতে ব্যাগ ঝুলছে। তার পিছন পিছন পাহাড় আর গরিলাও বেরিয়ে এল। হাসছে ওরা দু'জনে। রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠল নাদিরার লাল পরচুলা।

বাথরূমে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। সময় নিয়ে শাওয়ার-শেভ সারল। তারপর নতুন এক সেট প্যান্ট শার্ট পরে নেমে এল নিচে। পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। নিচে ওদের সঙ্গে যোগ দিল মাসুদ রানা। দিনের আলোর অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে, নাদিরার হাসি-খুশি, নিশ্চিন্ত চেহারা দেখে ভাবল ও। কয়েক ঘণ্টা আগের ভয়, আতঙ্কের চিহ্নমাত্র নেই তার মধ্যে।

একাই চারজনের নাস্তা সাবাড় করল রানা। তারপর দু'কাপ কফি ও দুটো সিগারেট গিলে খানিকটা সুস্থির বোধ করল। প্রয়োজনীয় তেল-পানি পেয়ে ফুলস্পীডে কাজ শুরু করে দিল ওর মস্তিষ্কের কোষগুলো। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখল রানা ওদের সঙ্গে নিয়ে। প্রকাণ্ড এক শপিং সেন্টার আসলে এটা, দাঁড়িয়ে আছে তিনমুখো রাস্তার সংযোগস্থলে। নতুন সেন্টার, কনস্ট্রাকশন শেষ হয়নি এখনও। আধখানা চাঁদের মত গোল কমপ্লেক্সটা।

কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর, অসংখ্য বড় বড় দোকান, রেস্তোরাঁ, বুটিক, সিনেমা হাউস ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় খুদে একটা শহর। অবশ্য সব দোকান চালু হয়নি এখনও। সামনের পার্কিং-লটটা বিরাট। কমপ্লেক্সের এক মাথায় সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে ওদের হোটেল, হোটেল চেরিব্লসম। তার পরেরটা একটা ছয় তলা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। ওর পাশেরটা সিনেমা হাউস। গায়ে গায়ে লাগিয়ে তোলা হয়নি ভবনগুলো, প্রতিটির মাঝে ব্যবধান রয়েছে পাঁচ-ছয় ফুট করে। মার্কেটের নাম ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড। ওয়াণ্ডারফুল, ভাবল মাসুদ রানা।

‘চমৎকার জায়গা!’ মৌনতা ভঙ্গ করল নাদিরা। ‘সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, পোস্ট অফিস, লণ্ড্রি, বেকারি, মেন’স-উইমেন’স ক্লোদিং, আর কি চাই? পুরো একটা মাস কাটিয়ে দিতে পারি আমরা এখানে।’

‘দুঃখিত। অত সময় দেবে না তোমাকে রবার্টো গার্সিয়া।’

কল্পনার জগৎ থেকে আচমকা ফিরে এল যেন নাদিরা কঠিন বাস্তবে। হাসি মুছে গেল মুখের। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। ‘ভুলেই গিয়েছিলাম।’

খাওয়ার প্রয়োজনে বের হওয়া ছাড়া দিনের বাকি অংশ রূমেই কাটাল ওরা সবাই। রানা বাদে অন্যরা টিভি দেখা, গল্প-গুজব আর ঘুম, এই করে পার করল। রানা পড়ে থাকল র‍্যালেতে কেনা সরঞ্জাম ও ডজনখানেক ডায়মণ্ডের দামী নেকলেস, ইয়ার রিং নিয়ে। সলভেন্ট ঢেলে সেটিং থেকে পাথরগুলোকে প্রথমে আলগা করল মাসুদ রানা, তারপর লং নোজড প্লায়ার্সের সাহায্যে ভেতর থেকে তুলে আনল ওগুলো। চেইনগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। প্রথম সুযোগেই গলিয়ে ফেলবে ও টুকরোগুলো পরে তাল বানাবে তাই দিয়ে।

শুনে মনে হয় খুব সহজ কাজ বুঝি, আসলে খুবই কঠিন। অত্যন্ত ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়। নইলে যদি কোনরকমে একটা পাথরের কোনা ভেঙে যায়, বা ঘষা লেগে স্বচ্ছ ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়, ঝপ করে চার ভাগের এক ভাগে নেমে আসবে তার দাম। বেশিরভাগ পাথরই আবার নিচ থেকে উঠে আসা আঙুলের মত দেখতে দাঁড়া দিয়ে আটকানো। আঙুলগুলো যেন মুঠ করে ধরে রেখেছে পাথরটাকে, যাতে পড়ে না যায়।

দাঁড়াগুলো একটা একটা করে টেনে সোজা করা, তারপর ভেতরে সলভেন্ট ঢেলে সেটিং থেকে পাথর আলগা করা, সেটা

বের করে আনা, প্রচুর সময় সাপেক্ষ কাজ। কেবল বড় পাথরগুলো খুলল মাসুদ রানা, ছোট ডেকোরেটিভ ডায়মণ্ড চিপস্ রেখে দিল সেটিঙের সঙ্গেই। গভীর রাতে ক্ষ্যান্ত দিল মাসুদ রানা। এক ডজন ছোটবড় ডায়মণ্ড এবং কেজিখানেক সোনা জমেছে তখন টেবিলে।

'এগুলো বেচলে আগের দাম পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ও থাকল না আর। কোন্ পাথর কোন্ দোকান থেকে খোওয়া যাওয়া কোন্ নেকলেস বা ইয়ার রিঙের, বিন্দুমাত্র উপায় নেই বোঝার। ক্রেতাকে সহজেই বোঝাতে পারবে তুমি, পাথরগুলো ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিনে জমিয়েছ তুমি নগদ টাকার বদলে। এখন ক্যাশ দরকার, তাই বেচতে চাইছ। কেউ কোন প্রশ্ন করতে যাবে না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তোমরা।' টুলসগুলো চামড়ার একটা ব্যাগে ভরে বাথরূমে গিয়ে ঢুকল মাসুদ রানা।

এদিকে নাদিরা, ফয়েজ ও বিল্লাহ অনুমান করতে বসল কোন পাথরটার দাম কত হতে পারে।

পরের দিনটা কেটে গেল কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই। খেয়ে, শুয়ে-বসে আর নিচের পার্কিং-লটে চোখ রেখে সময় পার করল ওরা। রানা আগেরদিনের মতই ভাঙাচোরার কাজে ব্যস্ত থাকল। দুপুরে খাওয়ার সময় কি চিন্তা করে বুইকটা হোটেলের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা। রেখে এসেছে পাশের এক ডিপার্টমেন্ট স্টোরের জেনারেল পার্কিং-লটে। হোটেলের সামনে তেমন একটা গাড়ি নেই, ফাঁকা জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা বুইকটা থেকে থেকে খোঁচাচ্ছিল চোখে।

আরও একদিন কাটাল ওরা হার্ডিভিলে। পরদিন দুপুর থেকে শুরু হলো বাঁধা-ছাদার কাজ। ধীরেসুস্থে গোছগাছ করে নিল

ওরা। সন্ধের পর নিচ থেকে রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে এল। কিছু সময় বিশ্রাম নিল। আটটার সময় শেষ সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

'আমি নিচে যাচ্ছি,' বলল ও। 'গাড়িটা হোটেলের সামনে রেখে অপেক্ষা করব। ঠিক দশ মিনিট পর নেমে আসবে তোমরা।'

'আপনি কেন, মাসুদ ভাই?' বলল মুত্তাকিম। 'আমরা একজন যাই!'

'না, আমিই যাচ্ছি। জাস্ট ওয়েট।'

বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা। দশ মিনিট নয়, মাত্র দু'মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরেও এল। চেহারা থমথমে। 'ঝামেলা।'

ছাঁৎ করে উঠল নাদিরার বুক। 'কি!'

'এসে পড়েছে ওরা।'

'রবার্টো?'

'আর কে?'

'হায় আল্লাহ্!' ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল মেয়েটি। চেহারা দেখে ভয় হলো এখনই কেঁদে উঠতে যাচ্ছে। 'এখন কি হবে?'

'নিচে কোথায় দেখেছেন ওকে?' জানতে চাইল বিল্লাহ।

'ডেস্কে। কথা বলছে রিসেপশনিস্টের সাথে।'

'ওপরে উঠে আসবে না তো?' সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত আচরণ করতে শুরু করেছে নাদিরা। ভালই জানে ও, এটা গেম কক নয়। পালাতে হলে নিচে নামতে হবে, হয় সিঁড়ি দিয়ে, নয়তো এলিভেটর দিয়ে। অথচ তার একটাও সম্ভব হবে না যদি রবার্টো নিচে বসে থাকে পথ আগলে। যদি উপরে উঠে আসে সে দলবল নিয়ে...।

'না, তা করবে না। হোটেলে গোলাগুলির ঝুঁকি নেবে না ওরা। ওরা নিশ্চই নিচে পাহারা বসাবে, অপেক্ষায় থাকবে কখন আমরা নামব।'

অস্ফুটে বলে উঠল ফয়েজ, 'সেরেছে!'

উঠল মাসুদ রানা। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলল। 'হ্যালো! স্যাম মরিসন বলছি রূম নাম্বার ফোর টেন থেকে। আমার কয়েকজন বন্ধু আসার কথা ছিল, এসেছে কেউ? আচ্ছা! গুড! কয়জন? আট জন, না? হ্যাঁ, ঠিক আছে। লবিতে অপেক্ষা করছে ওরা? আই সী! না, কিছু বলতে হবে না। আমি নিজেই আসছি। ধন্যবাদ।'

ফোন রেখে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'যা ভেবেছিলাম! নিচে অপেক্ষা করছে ওরা লবিতে।'

'আট জন?' প্রশ্ন করল বিল্লাহ।

'হ্যাঁ। তবে আমার ধারণা সংখ্যাটা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে। নিশ্চই আরও লোকজন ডাকবে এখন রবার্টো, পুরো এলাকা সীল করে দেবে যাতে আর কোন চাল চাললেও ব্যর্থ করে দেয়া যায় আমাদের।'

'আরেকবার ফায়ার আর পুলিস ডিপার্টমেন্টের সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?' বলল নাদিরা।

মাথা নাড়ল মাসুদ রানা। 'এ জায়গা গেম ককের তুলনায় অনেক বড়। পালাতে পারব না আমরা।'

চিন্তিত মুখে পায়চারি করতে লাগল মাসুদ রানা। অস্বাভাবিক গম্ভীর। কোন আশা দেখতে পাচ্ছে না ও উদ্ধারের।

'আমার প্ল্যানটা এখানে খাটালে কেমন হয়, মাসুদ ভাই?' সাহস করে বলে উঠল বিল্লাহ।

'উঁহুঁ, চলবে না। কেবল আমরা হলে নেয়া যেত ঝুঁকিটা।

কিন্তু নাদিরা আছে আমাদের সঙ্গে। কাজেই ওরকম কিছু করতে যাওয়া হবে চরম বোকামি। মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে।'

নীরবতা।

পায়চারি করছে মাসুদ রানা। ওদের তিন জোড়া চোখ অনুসরণ করছে তাকে। এক সময় থেমে পড়ল রানা। তাকাল বিল্লাহ ও ফয়েজের দিকে। 'আর কোন আইডিয়া পেয়েছ কেউ?'

'ফায়ার এস্কেপ দিয়ে চেষ্টা করতে পারি আমরা,' বলল ফয়েজ।

'ওখানে কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে গেছে অনেক আগেই।'

'বেজমেন্ট?' বলল বিল্লাহ।

'ওখান থেকে বেরুতে হলে ফায়ার এস্কেপের দরজার পাশ দিয়েই বেরুতে হবে, আমি দেখেছি চেক্ করে।'

আবার কিছুক্ষণ চলল রানার পায়চারি। এবং আচমকা থমকে দাঁড়াল ও, মুচকে হাসল ওদের দিকে তাকিয়ে।

'কি?' জিজ্ঞেস করল নাদিরা।

'আমরা সবাই নিচে নামার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেবল। কারণ যুক্তিমতে পালাবার রাস্তা নিচেই।'

'কি বলতে চাও?' চোখ কোঁচকাল মেয়েটি।

'ওপরদিক থেকে একবার চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'মানে?'

ফয়েজ ও বিল্লাহর দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'হোটেলের ছাদ থেকে লাফিয়ে যদি পাশের দালানের ছাদে যেতে পারি, তাহলে একটা চান্স আছে, কি বলো তোমরা?'

খুশিতে লাফিয়ে উঠল পাহাড়। 'তাই তো! ঠিক বলেছেন, মাসুদ ভাই!'

ফয়েজ হাসল দাঁত বের করে। 'চলুন। শালারা বসে বসে

আণ্ডা পাড়□ক, আমরা হাওয়া হয়ে যাই ।’

‘দাঁড়াও । এখনই এত আশাবাদী হয়ো না । আগে ছাদ থেকে ঘুরে দেখে আসি অবস্থা । ফয়েজ এসো আমার সাথে । বিল্লাহ্, দরজা লাগিয়ে দাও । আমার গলা না শোনা পর্যন্ত দরজা খুলবে না কিছুতেই । ওকে?’

‘ওকে ।’

বেরিয়ে গেল ওরা ।

পাঁচ

পনেরো মিনিট হয়ে গেছে রানা-ফয়েজ বেরিয়েছে, এখনও ফেরার নাম নেই । নিজের খাটে ফ্যাকাসে মুখে বসে আছে নাদিরা, বিল্লাহ্ বসেছে দরজার দিকে মুখ করে, একটা আর্মচেয়ারে । ঘন ঘন টেনে তিনটে সিগারেট পুড়িয়েছে সে এর মধ্যে, চতুর্থটা ধরাবার আয়োজন করছে । দরজার কাছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওদের সব লাগেজ ।

এক জোড়া পায়ের আওয়াজ উঠল দরজার বাইরে, এদিকেই আসছে । স্থির হয়ে গেল বিল্লাহ্, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকল দরজার দিকে । পরক্ষণেই মাসুদ রানার গলা শুনে ছুটে গিয়ে খুলে দিল সে দরজা । হাসি মুখে ভেতরে ঢুকল ওরা দু’জন ।

‘চলো,’ নাদিরার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা । বিল্লাহর দিকে ফিরল । ‘ছাদ দিয়েই পালাতে হবে । পাশেরটা একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর, উচ্চতা এটার সমান । মাঝখানের ফুট পাঁচেক ব্যবধান লাফিয়ে পার হতে পারলেই হলো ।’

‘পাঁচ ফুট মাত্র!’ তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল পাহাড়ের মুখে ।

‘কিন্তু নাদিরা? ও পারবে লাফিয়ে পার হতে?’

‘ভয় করবে ঠিকই। কিন্তু সাহস করে লাফ দিলে ঠিকই উৎরে যাবে। চলো, চলো। সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।’

যেটুকু রং ছিল চেহারায়, সেটুকুও গায়েব হয়ে গেল নাদিরার পরিকল্পনা শুনে। আবার বসে পড়ল সে ধপ করে। ‘অসম্ভব, রানা। আমি পারব না। তোমরা বরং আমাকে রেখে চলে যাও।’

‘বাজে বোকো না!’ ধমকে উঠল মাসুদ রানা। ‘আগে ওপরে চলো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে ফাঁকটা কত সরু। একটা বাচ্চা মেয়েও অনায়াসে লাফিয়ে পেরিয়ে যেতে পারবে।’

জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল মেয়েটি। মৃদু কাঁপুনি উঠে গেছে দেহে। ‘সম্ভব নয়। ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না কোনদিনও। দোহাই লাগে, তোমরা চলে যাও। আমার জন্যে নিজেদের বিপদ আর বাড়িয়ো না, প্লীজ!’

‘আচ্ছা, বেশ। ওপরে গিয়ে ফাঁকটা দেখতে তো অসুবিধে নেই! আগে চলোই না। দেখে যদি অসম্ভব মনে হয় তোমার, তখন বোলো। তখন না হয় অন্য চিন্তা করা যাবে। এখন দয়া করে ওঠো, রবার্টো যদি সিদ্ধান্ত পাল্টে ওপরে চলে আসে, তাহলে বিপদ হয়ে যাবে। চলো।’

বেরিয়ে এল ওরা। বিল্লাহ আর ফয়েজের হাতে দুটো করে সুটকেস। মাসুদ রানার বাঁ হাতে নাদিরার ব্রিফকেস, একই কাঁধে একটা শোল্ডার ব্যাগ, এবং ডান হাতে সাইলেন্সার লাগানো ওয়ালথার। নাদিরার কাঁধে একটা শোল্ডার ব্যাগ। সামনে থাকল রানা, তারপর নাদিরা। ওর পিছনে ফয়েজ, সবশেষে বিল্লাহ। নির্জন করিডর দ্রুত অতিক্রম করে পিছনের ফায়ার এস্কেপের সামনে চলে এল ওরা। এলিভেটরে চড়ার ঝুঁকি নেয়নি রানা ইচ্ছে করেই, কারও চোখে পড়ে যেতে পারে ওদের আকাশ পথে

পালানোর কসরত।

লোহার পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে প্রায় নিঃশব্দে ছাদে উঠে এল ওরা মিছিল করে। টপ ফ্লোরে উঠে শেষ হয়ে গেছে লোহার সিঁড়ি। তার পাশেই শান বাঁধানো চওড়া সিঁড়িঘর, ছাদ থেকে সোজা নেমে গেছে বেসমেন্টে।

বেশ শীত পড়েছে আজ। তার ওপর বইছে কনকনে উত্তুরে বাতাস। ঝকঝকে নির্মেঘ নীল আকাশ, তার গায়ে হীরের দ্যুতি নিয়ে জ্বলছে অগুনতি নক্ষত্র। পায়ের নিচে ছড়ানো পানির পাইপ আর ভেন্টিলেশন গ্যাপ এড়িয়ে সাবধানে কিনারার দিকে এগোল ওরা। এক হাতে নাদিরার বাহু ধরে রেখেছে মাসুদ রানা। কিনারার ফুটখানেকের ব্যবধানে এসে দাঁড়াল সবাই। সামনেই হাঁ করে আছে যেন দুই বিল্ডিঙের মাঝের ফাঁকটা। কালো।

অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল নাদিরার। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল সে, 'এই গ্যাপ কিছুতেই সাত ফুটের নিচে হতে পারে না।'

'আরে না!' বলল মাসুদ রানা। 'পাঁচ ফুটের এক ইঞ্চিও বেশি হবে না। এই গ্যাপ পেরুনো পানির মত সহজ। বিলিভ মি!'

বোবা জানোয়ারের মত এপাশ ওপাশ মাথা দোলাতে লাগল মেয়েটি, হাত ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে জোরাজুরি করছে। 'ন্না! প্লীজ, রানা! আমি পারব না। ছেড়ে দাও আমাকে। কিছুতেই পারব না আমি।'

'আচ্ছা, শান্ত হও। দেখ। ফয়েজ, একটা লাফ দিয়ে দেখাও তো নাদিরাকে কাজটা কত সহজ!'

সুটকেস রেখে ওভারকোট খুলল সে। ওটা পায়ের কাছে দলা করে ফেলে তিন পা পিছিয়ে গেল। পিচ্চি একটা দৌড় দিয়েই শূন্যে ভেসে পড়ল ফয়েজ আহমেদ, নিঃশব্দে প্রকাণ্ড একটা কালো বাদুড়ের মত উড়ে গিয়ে ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ছাদে পড়ল।

পড়েই এক পা এগিয়ে দিয়ে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করল সে, ঘুরে দাঁড়াল। অন্ধকারে তার দাঁতের আভাস দেখতে পেল সবাই, হাসছে গরিলা।

'দেখলে? শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ তুমি। একটু সাহস দরকার কেবল, তাহলেই দেখবে কত সহজ এই সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করা।'

উঁকি দিয়ে ফাঁকটা ভাল করে দেখল আরেকবার মেয়েটি। তারপরই সভয়ে পিছিয়ে এল। 'ওরে বাবা!'

'নিচে তাকিয়ো না।'

'আমি পারব না, রানা।'

'নিশ্চই পারবে! নিজের চোখেই তো দেখলে মোটেই কঠিন নয় কাজটা।'

'না, পারব না।'

'মনে করো সামান্য কাদা-পানি জমে আছে পথের ওপর, লাফিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছ তুমি। সামান্য একটা কাজ।'

'অসম্ভব! কিছুতেই পারব না আমি!' ফুঁপিয়ে উঠল নাদিরা।

'একশোবার পারবে! পারতেই হবে তোমাকে।' খেপে গেল মাসুদ রানা।

শব্দ করে কেঁদে উঠল মেয়েটি। 'না না, পারব না আমি! কিছুতেই পারব না। তুমি জানো না, উঁচু জায়গার ভীতি আছে আমার। হাজার চেষ্টা করলেও এ ভয় মন থেকে যাবে না এখন, বিশ্বাস করো।' নাক টানল নাদিরা। 'তারচে' সময় নষ্ট না করে তোমরা চলে যাও, রানা। দোহাই লাগে! আমার জন্যে নিজেদের জীবন বিপন্ন কোরো না। চলে যাও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। কোমরে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকাল। কথা নেই কারও মুখে। 'কি হলো?'

পাশের ছাদ থেকে চাপা গলায় ডাকল ফয়েজ। 'আসছেন না কেন কেউ? দেরি হয়ে যাচ্ছে তো!'

'বিল্লাহ, সুটকেসগুলো ছুঁড়ে দাও ফয়েজের দিকে। ওর ওভারকোটটাও।'

নীরবে নির্দেশটা পালন করল পাহাড়। সুটকেস, শোল্ডার ব্যাগ, ওভারকোট, সব একে একে ছুঁড়ে দিল পাশের ছাদে। ক্যাচ ধরে পায়ের কাছে সব সাজিয়ে রাখল ফয়েজ।

'চলে যাও তোমরা, রানা,' কাঁপা গলায় বলল নাদিরা। 'প্লীজ, চলে যাও। আমাকে নিয়ে...'

'শাটাপ্!' ধমকে উঠল রানা। 'বিল্লাহ, এদিকে এসো তো!'

চিলেকোঠার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। পরখ করছে রানা দরজাটা। দুই ইঞ্চি পুরু কাঠের তৈরি ছয় বাই সাড়ে তিন হবে দরজাটা। তিনটে কবজার ওপর ঝুলে আছে। 'পাল্লাটা খুলে ফেলার চেষ্টা করে দেখা যাক, কি বলো?'

কবজাগুলো স্পর্শ করে দেখল বিল্লাহ। মাথা ঝাঁকাল। 'মনে হয় পারা যাবে, মাসুদ ভাই।'

'এসো, দু'জনে মিলে ট্রাই...'

'তার কোন দরকার নেই। সরে যান। আগে আমি একা চেষ্টা করে দেখি খানিক। তারপর প্রয়োজন হলে...।' বলতে বলতে মস্ত দুই থাবায় সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল পাহাড় দরজার ওপরটা, মেঝেতে পা বাধিয়ে দেহের সব শক্তি এক করে এক হ্যাঁচকা টান মারল বাইরে এবং নিচের দিকে। নাক দিয়ে আপনাআপনি একটা 'হুঁক্' জাতীয় আওয়াজ বেরুল তার। কিচ্ছু হলো না, কবজায় অনড় দাঁড়িয়ে আছে কাষ্ঠ-কপাট।

সোজা হয়ে দাঁড়াল পাহাড়। বুক চিতিয়ে দম নিল, রানাকে এগোতে দেখে হাত তুলে নিষেধ করল, পরমুহূর্তে আরেক হ্যাঁচকা

টান মারল পাল্লা ধরে। এবারের ‘হুঁক্’টা হলো আরও জোরাল। কট কট দুটো আওয়াজ উঠল পর পর, ভেঙে গেছে ওপরের কবজার দুটো স্ক্রু। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল বিল্লাহর। পরের টানে আরও দুটো স্ক্রু ভাঙল। পাঁচ মিনিটের মাথায় আস্ত পাল্লাটা একাই মেঝেতে শুইয়ে ফেলল বিল্লাহ। তর্জনী দিয়ে কপাল আঁচড়ে ঘাম ঝরাল। প্রকাণ্ড বুকের ছাতি ঘন ঘন ওঠানামা করছে, দম ছাড়ছে ফোঁস ফোঁস।

দু’জনে মিলে উঁচু করে ছাদের কিনারায় নিয়ে এল পাল্লাটা, দুই ছাদের মধ্যে সেতু বানাল ওটা দিয়ে। সতর্কতার সঙ্গে করতে হলো কাজটা। দেহের প্রায় সবটুকু শক্তি এক করে পাল্লাটা এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে পাশের ছাদের দিকে ঠেলে এগিয়ে দিল রানা ও বিল্লাহ। ওপাশ থেকে যতটা সম্ভব সামনে ঝুঁকে ওটার প্রান্ত ধরল ফয়েজ, তারপর টেনে নিয়ে বসাল কিনারায়। দেখা গেল, ওদের অনুমানই ঠিক, মাপা পাঁচ ফুটের ব্যবধান দুই ছাদের মধ্যে। দুই দিকেই ছয় ইঞ্চি করে বাড়তি রয়ে গেল সেতুর দুই প্রান্ত।

সেতুর ওপর উঠে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ‘চোখ বন্ধ করে আমার হাত ধরো,’ নাদিরাকে বলল ও। ‘এসো।’

চোখ বুজল ঠিকই মেয়েটি, কিন্তু কাঁপুনি বেড়ে গেল বহু গুণ। হাত বাড়িয়ে অন্ধের মত এগোল। ওকে ধরে সেতুর ওপর সঠিক জায়গায় পা রাখতে সাহায্য করল বিল্লাহ। ‘আল্লার নাম নিয়ে পা বাড়ান, কোন ভয় নেই। আপনার পিছনেই আছি আমি। পড়লে সবাই এক সঙ্গে পড়ব,’ বলেই আঁতকে উঠল সে নাদিরাকে ব্রেক কষতে দেখে। ‘না না, পড়ব না! ও একটা কথার কথা। চলুন চলুন।’

যেন কয়েক যুগ পর মাসুদ রানার গলা শুনতে পেল নাদিরা।

'হয়েছে। এসে গেছি আমরা। চোখ খুলতে পারো এবার।'

চোখ মেলে তাকাল নাদিরা। হোটেল বিল্ডিঙের দিকে তাকাল মুখ ঘুরিয়ে। তারপর ওদের দিকে। মুখে সলজ্জ হাসি।

দরজাটা টেনে আনার সংগ্রামে লিপ্ত হলো এবার ওরা তিনজন। ভীষণ ওজন, ছাদের কিনারা গলিয়ে নেমে আসতেই ঝপ্ করে নিচের দিকে রওনা হয়ে যেতে চাইল পাল্লাটার ওপ্রান্ত, পতনটা রোধ করতে শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যয় করতে হলো ওদের তিনজনকেই। এপাশের মিলিত শক্তির কাছে পরাজয় মানতে বাধ্য হলো দরজাটা। খানিকটা নেমে থেমে গেল, দোল খেলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর টান খেয়ে রওনা হয়ে গেল পাশের ছাদের দিকে।

একই কায়দায় তার পাশের মুভি থিয়েটার ভবনের ছাদে চলে এল ওরা। প্রথমবারের মত এবারও সেতুতে চড়ার সুযোগ হলো না ফয়েজের, অগ্রবর্তী সাহায্যকারী হিসেবে লাফিয়ে পেরুতে হলো তাকে। থিয়েটার ভবনের দূরত্ব বেশি, প্রায় দশ ইঞ্চি মত। ফলে দুই ছাদের কিনারায় সেতুর মার্জিন থাকল মাত্র এক ইঞ্চি করে। সবার শেষে পার হলো বিল্লাহ। প্রায় নাচতে নাচতে এল সে মাঝখান পর্যন্ত। থেমে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। থুথু ফেলল শব্দ করে। তারপর দুই পদক্ষেপে এপারে। থিয়েটারের ওপাশের বাড়িটা অনেক নিচু, কোনমতেই যাওয়া যাবে না ওটায়। তাই এটা দিয়েই নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা।

'দরজাটার কি ব্যবস্থা করা যায়, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল ফয়েজ। 'নিয়ে আসব এপাশে, না ফেলে দেব?'

'এপাশে এনে রাখাই নিরাপদ। ফেলে দিলে শব্দ হবে খুব। জানাজানি হয়ে যাবে তাহলে।'

কাজটা সারতে প্রচুর সময় লাগল এবার। ছাদের ওপর

পাল্লাটা শুইয়ে রাখা হলো নিঃশব্দে। 'এবার এদের ফায়ার এস্কেপ খুঁজে বের করতে হয়,' বলল রানা। 'একেক জন একেক দিকে যাও, খোঁজো। ওটা বাইরের দিকে থাকার সম্ভাবনাই বেশি!'

ছড়িয়ে পড়ল ওরা তিনজন। নাদিরা দাঁড়িয়ে থাকল মাঝখানে। ওর খোঁজার প্রশ্নই আসে না। কারণ এ দালানের ফায়ার এস্কেপ রুট নিশ্চই অন্তত এক ফ্লোর নিচে, এবং বাইরে। ওটা বের করতে হলে কিনারা দিয়ে নিচে ঝুঁকতে হবে তাকে। অসম্ভব! অবাক হয়ে তিন পুরুষ সঙ্গীর কার্যকলাপ দেখতে থাকল সে। ভেবে পেল না ওরা কোন্ সাহসে দেহের অর্ধেক বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে।

সিঁড়িটা আবিষ্কার করল ফয়েজ আহমেদ। এক ফ্লোর নিচেই। ছাদে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে খুব সাবধানে নেমে এল ওরা। যদিও তার খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। মানুষজনের ছায়াও নেই ধারেকাছে। ভেতরে ছবি চলছে। মারামারির 'ধাঁই' 'ধুঁই', আর গোলাগুলির, 'ঠাঁই' 'ঠুঁই' শব্দে গরম হয়ে আছে হল। এটার ফায়ার এস্কেপের সিঁড়িও লোহার, তবে পেঁচানো নয়, আঁকাবাঁকা, জিগজ্যাগ। নিচের দিকে তাকাতেই মাথার মধ্যে চক্কর মেরে উঠল নাদিরার। চোখের পাতা জোরে বুজে রেখে, এক হাতে মরচে পড়া রেলিং শক্ত মুঠোয় ধরে এক পা এক পা করে নামতে লাগল সে।

একেবারে শেষ ফ্লোরের সিঁড়িটা বিশেষ সিঁড়ি, কাউন্টারওয়েইটেড সুইং স্টেয়ার। ফার্স্ট ফ্লোরের কার্নিস বরাবর ঝুলছে ওটা হাতলসহ। এক হাতে হাতল ধরে সিঁড়ির একমাত্র বেরিয়ে থাকা ধাপটায় পা রাখল বিল্লাহ, অন্যহাতে একটা সুটকেস। ওর দেহের ভারে শক্তিশালী স্প্রিং ফিট করা সিঁড়িটা মাটির দিকে নামতে শুরু করল সড় সড় করে।

ধাপের ওপর থেকে পা না সরিয়ে ঝুঁকে সুটকেসটা মাটিতে রাখল বিল্লাহ, তারপর নেমে পড়ল। এক হাতে টেনে ধরে রেখেছে সিঁড়ির হাতল, যাতে ভারশূন্য হয়ে পড়ায় স্প্রিঙের টানে উঠে না যায়। সবাই নেমে এলে হাতল ছেড়ে দিল বিল্লাহ, সাঁ করে উঠে গেল সিঁড়িটা, নাগালের বাইরে চলে গেল।

মুভি হাউস ও ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মাঝখানের ফাঁকায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সামনের কমপ্লেক্সে লোকজন, গাড়িঘোড়ার আসা-যাওয়া, ব্যস্ততা দেখতে পাচ্ছে ওরা পরিষ্কার, কিন্তু ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। অবশ্য থিয়েটার এবং স্টোর, দুটোরই কোণে, রাস্তার দিকের প্রান্তে বাঁকানো পাইপের মাথায় জোরাল আলো জ্বলছে। পিছনে শেড আছে বলে এদিকে আসছে না আলো। মাত্র কয়েক গজ সামনে গিয়ে বাঁয়ে ঘুরলেই বুইকের কাছে পৌঁছে যেতে পারে ওরা। ডিপার্টমেন্ট স্টোরের সামনের জেনারেল পার্কিং লটে রয়েছে ওটা।

বাঁ হাতে একটা সুটকেস তুলল বিল্লাহ, আরেকটা ভরল বাঁ বগলের তলায়। ডান হাতে শোভা পাচ্ছে তার ভয়ঙ্কর দর্শন এক লুগার। 'আমি আগে যাই, মাসুদ ভাই,' বলল সে। 'বুটে রেখে আসি মালপত্র।'

'দাঁড়াও। আমিও যাব।' রানা নিল একটা সুটকেস আর নাদিরার ব্রিফকেস। 'ফয়েজ, তুমি আর নাদিরা অপেক্ষা করো। আমরা আসছি।'

সতর্ক পায়ে গলিটা পেরিয়ে দুই বিল্ডিঙের মুখের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল বাঁয়ে। মাত্র দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বুইক রিভেরা। তার আরও গজ দশেক ওপাশে, চার-পাঁচটা গাড়ির আড়ালে দেখা গেল পাশাপাশি দুটো প্রকাণ্ড কালো গাড়ি। রবার্টোর গাড়ি। দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল।

ভেতরটা ফাঁকা, নেই কেউ। এগোল ওরা, বেরিয়ে এল উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের সামনের খোলা প্রান্তরে।

চেরিব্লসমের প্রবেশ পথের ওপর সতর্ক নজর রেখে দ্রুত পায়ে বুইকের পিছনে এসে দাঁড়াল ওরা। বুট খুলে ঝটপট ভেতরে ঢোকাল বোঝা চারটে, লাগিয়ে দিল বুটের ডালা। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল মাসুদ রানা। 'নিয়ে এসো ওদের তাড়াতাড়ি।'

পা চালাল বিল্লাহ। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে দুই বোঝা নিয়ে বেরিয়ে এল সে কানা গলি থেকে। তার পিছনে ভীত সন্ত্রস্ত নাদিরা, সবশেষে ফয়েজ। হাতে অবশিষ্ট সুটকেসটা রয়েছে তার। পেভমেন্টে উঠে কয়েক পা এগিয়েই দীর্ঘদেহী এক লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেলো বিল্লাহ। বিড় বিড় করে ক্ষমা চেয়ে তার সামনে থেকে সরে গেল ও। কিন্তু লোকটা নড়ল না। চোখ কুঁচকে পালা করে দেখছে ওদের। ব্যাপারটা লক্ষ করে আঁতকে উঠল মাসুদ রানা, দেখামাত্র বুঝেছে, লোকটা রবার্টোর সেলসম্যানদের একজন।

লম্বা। গায়ে টপকোট, মাথায় চওড়া কিনারাওয়ালা ফেডোরা হ্যাট। স্টোর থেকে বেরিয়ে আসছিল লোকটা, হাতে এক প্যাকেট সিগারেট ও একটা বীয়ারের ক্যান। একটু দেরিতে হলেও, রানার মত ফয়েজও টের পেল বিপদটা, থমকে গেল সে। হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল লোকটা। সিগারেট, বীয়ার ফেলে চট করে ডান হাত টপকোটের পকেটে সেঁধিয়ে দিল, মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার। পলকে বের করে ফেলেছে সে একটা কোল্ট।

এক লাফে ওদের আর লোকটার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াল ফয়েজ, সুটকেসটা দু'হাতে বুকের সামনে বর্মের মত ধরে ষাঁড়ের মত ছুটে গেল লোকটার মাঝে। 'বিল্লাহ, সাবধান!' বলেই ঝাঁপ

দিল সে। একই মুহূর্তে ফয়েজকে লক্ষ্য করে গুলি করল লম্বা, প্রচণ্ড 'কড়াক!' শব্দে আঁতকে উঠল পুরো কমপ্লেক্স। মৃদু ধাতব একটা আওয়াজ উঠল, সুটকেসের নরম চামড়া ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে বুলেটটা, বাধা পেয়েছে সোনার স্তূপে।

বুনো শুয়োরের মত 'ঘোঁৎ' করে উঠল ফয়েজ প্রচণ্ড রাগে। দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে গেছে। ওদিকে দুই বোঝা এক হাতে নিয়ে অন্যহাতে কোমর জড়িয়ে ধরে নাদিরাকে কাঁখে লটকে তীরবেগে গাড়ির দিকে ছুট লাগিয়েছে বিল্লাহ। পলকে দূরত্বটুকু পেরিয়ে গেল সে। অন্যদিকে এক পা বাইরে বের করে, হাতে ওয়ালথার ধরে আকস্মিক আপদটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। উদ্বিগ্ন। খুব সহজ একটা টার্গেট, কিন্তু ফয়েজের গায়ে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে গুলি করতে সাহস হচ্ছে না।

ছোট একটা লাফ দিয়েই সুটকেসসমেত লম্বার ঘাড়ে চড়াও হলো ফয়েজ অসুরের শক্তি নিয়ে। আগের মতই বর্ম হিসেবে বুকের সামনে ধরে রেখেছে সে ওটা। টলে উঠল লোকটা, পরমুহূর্তে আক্রমণকারীর দেহের ভারে হুড়মুড় করে পড়ে গেল চিত হয়ে, তার অজান্তেই আঙুলের চাপ লেগে বেরিয়ে গেল দ্বিতীয় গুলি। সোজা আকাশের দিকে ছুটল ওটা।

পেড়ে ফেলেই লোকটার বুকের ওপর চেপে বসল প্রাক্তন হেভিওয়েট বক্সার। বাঁ হাতে নারকেল থ্যাঁতলানো প্রচণ্ড এক ঘুসিতে নাকমুখ সমান করে দিল তার পেভমেন্টের সঙ্গে। অসহ্য যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লম্বা, হাত থেকে ছুটে গেছে আগ্নেয়াস্ত্র। দু'হাতে সুটকেস তুলল ফয়েজ, ওটা দিয়ে ভয়ঙ্কর এক আঘাতে কপাল এক ইঞ্চি ভেতরে দাবিয়ে দিল তার। মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এল লোকটার গলা দিয়ে, পর মুহূর্তে থেমে গেল

সে চিরতরে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেল এত কিছু। রাগের মাথায় আবার সুটকেস তুলল ফয়েজ, এই সময় পায়ের শব্দ পেল। ধুপ ধাপ পা ফেলে ছুটে আসছে কয়েকজন।

গুলির শব্দে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল আরও দুই টপকোট। এপাশের দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল তারা, তারপরই কোটের প্রান্ত উড়িয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে শুরু করল। দুটোরই ডান হাত বাঁ হাতের চেয়ে আট ইঞ্চি লম্বা। 'ফয়েজ!' চাপা কণ্ঠে হাঁকল মাসুদ রানা। 'চলে এসো!' বলেই পিস্তল তুলল ও। ছুটতে ছুটতেই সামনের টপকোট অস্ত্র তুলে ফেলেছে, গুলি করতে যাচ্ছে লোকটা ফয়েজকে।

'দুপ!'

সোজা তার মাথায় গিয়ে বিদ্ধ হলো রানার ছোঁড়া গুলিটা। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত হাস্যকর ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠেই আছড়ে পড়ল লোকটা, হাতের আগ্নেয়াস্ত্র খসে গেছে। শান বাঁধানো পেভমেন্টে খটাখট আওয়াজ তুলে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে থেমে পড়ল ওটা। সঙ্গীর অবস্থা চাক্ষুস করে ঘাবড়ে গেল অন্যজন, ঝপ্ করে বসে পড়ল পথের ওপর।

পুরো এলাকা কাঁপিয়ে দিয়ে ব্যাক করল বুইক রিভেরা, কয়েক গজ পিছিয়ে এসে তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে চিতার মত লাফ দিল সামনে, ঘুরেই বড় রাস্তার দিকে ছুটল তীরবেগে। একেবারে শেষ মুহূর্তে চেরিব্লসমের আলোকিত প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রবার্টো গার্সিয়ার ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। কোন রকম চাঞ্চল্য নেই তার মধ্যে। ওদের ধাওয়া করার ব্যস্ততা নেই।

দুই কোমরে হাত রেখে স্থির চোখে এদিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা। প্রশস্ত ঢালু কাঁধ, অসম্ভব চওড়া বুক। দাঁড়ানোর মধ্যে

রাজকীয় একটা ভাব আছে মানুষটার। পিনস্ট্রাইপড ভেস্টেড সুট পরে আছে রবার্টো, গলায় বো টাই। মাথায় বসানো রয়েছে দামী ব্রিটিশ বাউলার হ্যাট। গাড়ি বাঁক নেয়ার সময় স্থির চোখে একবার নাদিরা, আরেকবার মাসুদ রানাকে দেখল রবার্টো। সরাসরি ওদের চোখে চোখ রেখে। ভাবের লেশমাত্র নেই সে দৃষ্টিতে। চোখ দুটো যেন কোন মূর্তির, পাথুরে চোখ।

গায়ের মধ্যে শির শির করে উঠল মাসুদ রানার। মনে হলো কপাল ভেদ করে ওদের মগজে সেঁধিয়ে গেছে বুঝি রবার্টোর দৃষ্টি। কি ভাবছে ওরা, সব যেন দেখতে পাচ্ছে লোকটা। হঠাৎ কেমন খটকা লাগল যেন মাসুদ রানার। ব্যাটা কি হাসল শেষ মুহূর্তে? হ্যাঁ, তাইতো! কেন হাসল রবার্টো? কি অর্থ হতে পারে হাসিটার? মনে হলো যেন ব্যঙ্গ করল ওদের লোকটা। যেন বোঝাতে চাইছে, পালিয়ে যাবে কোথায় তোমরা? কত দূরে?

ছয়

কোথায় আছে ওরা সে সম্পর্কে তিলমাত্র ধারণা নেই নাদিরার। কোনদিক থেকে কোনদিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ওদের মাসুদ রানা, কে জানে! জানতে ইচ্ছেও করছে না তার। কেমন এক ঘোরের মধ্যে পড়ে আছে যেন নাদিরা, কিছুতেই কিছু যায়-আসে না। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, মন চাইছে এক ঘুমে পার করে দেয় বাকি জীবন।

সাভান্না অতিক্রম করে ডানে বাঁক নিল মাসুদ রানা, উঠে এল রুট সেভেন্টিন-এ। মিডওয়ের সামান্য আগে আরেকবার ডানে ঘুরে রুট এইটি টু-তে পড়ল। পশ্চিমে চলেছে। মাঝরাত নাগাদ

হাইনসভিল অতিক্রম করল ওরা। সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের জেসাপ। পথে দু'বার কিছুক্ষণের জন্যে থামল মাসুদ রানা। প্রথমবার কফি খাওয়ার জন্যে, মিডওয়ের আউটস্কার্টে। পরেরবার জেসাপে, তেল নেয়ার জন্যে।

জেসাপে বিল্লাহর হাতে স্টিয়ারিঙের দায়িত্ব দিল মাসুদ রানা, নিজে উঠল পিছনের সীটে, নাদিরার পাশে। রুট থ্রী ও ওয়ান ধরে ফোকস্টোনের দিকে চলেছে এখন ওরা। সেখান থেকে যাবে জ্যাকসনভিল, আবার হাইওয়ে নাইন্টি ফাইভ ধরবে সেখানে। রাত আড়াইটায় খুদে শহর ওয়েক্রসে পৌঁছল ওরা। হার্ডিভিল তিনশো কিলোমিটারেরও কিছু বেশি পিছনে ফেলে এসেছে এরমধ্যে।

একটা মোটেলে ভ্যাকান্সি নোটিস ঝুলতে দেখে যাত্রাবিরতি করল মাসুদ রানা। মোটেলটা তেমন একটা পরিচ্ছন্ন নয়, তবে সেদিকে নজর দেয়ার মত শারীরিক বা মানসিক অবস্থা কারও নেই। অন্যান্যবারের মত এবার রাত জেগে পাহারায় বসতে দিল না রানাকে বিল্লাহ ও ফয়েজ। প্রায় জোর করেই পাঠিয়ে দিল বিছানায়, ওরা পালা করে পাহারা দেবে আজ।

বিছানায় পিঠ ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম জয় করে নিল মাসুদ রানাকে, এক টানে তলিয়ে নিয়ে গেল সগভীর অতলে। সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল ওর বিকট শব্দে। মাথার কাছের বন্ধ জানালার বাইরে কোন আহাম্মক যেন ট্র্যাশ ক্যান খালাস করছে ডাম্প ট্রাকে। হাতের সঙ্গে সমান তালে মুখ চলেছে তার, শিস বাজাচ্ছে লোকটা বেদম জোরে। বিছানা ছাড়ল মাসুদ রানা। কান ঝালাপালা করা উৎকট আওয়াজ তুলে চলে গেল ডাম্প ট্রাক।

পাশের বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে নাদিরা। এক জোড়া পুরু কম্বলের নিচ থেকে দু'চোখ আর নাকের ডগাটা বেরিয়ে আছে

তার। এই প্রথম লক্ষ করল রানা, চেহারা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে। চোখের নিচে হালকা কালির ছাপ পড়েছে মেয়েটির। খুব স্বাভাবিক, ভাবল রানা, প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার, প্রাণ হারানোর আতঙ্ক তাড়িয়ে ফিরছে ওদেরকে। এ সময় এরকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

শব্দ না করে বাথরুমে ঢুকল মাসুদ রানা। শাওয়ার-শেভ সেরে ঝকমকে হয়ে বেরুল পনেরো মিনিট পর। তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল রুম থেকে। বিল্লাহ ও ফয়েজ আরও আগে থেকেই তৈরি হয়ে বসে আছে। মোটেলের রেন্টিং অফিসের দিকে চলল ওরা। ডেস্কের পিছনে ইয়া মোটা এক বুড়ি বসা আছে, নখে পালিশ লাগাচ্ছে যত্নের সঙ্গে। দৈর্ঘ্যে মাসুদ রানার অর্ধেকের সামান্য বেশি হবে হয়তো বুড়ি, কিন্তু প্রস্থে মাশাল্লাহ! ওর তিনটের কম হবে না কোনমতেই।

ওদের দেখে হাতের কাজ থেমে গেল বৃদ্ধার, রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'গুড মর্নিং, সানি! কি চমৎকার ঝলমলে সকাল, তাই না?'

'রাইট, ম্যাম।' বাউ করল মাসুদ রানা। 'সত্যিই চমৎকার।'

'তোমাদের জন্যে কি করতে পারি?'

'আপাতত তিন কাপ কফি চাই আমরা।'

'নিশ্চই!' পালিশ রেখে উঠল বৃদ্ধা। 'প্রতি কাপ পঁয়ত্রিশ সেন্ট।'

চেক-ইন ডেস্কের মাথায় দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। একটা ইলেক্ট্রিক কফি মেকার থেকে তিন কাপ কফি ঢালল। 'ক্যান্‌ড্‌ দুধ চলবে, সানি?'

'না, ধন্যবাদ। কালো কফি চাই।'

'চিনি?'

'এক চামচ করে, প্লীজ।'

কাপে কাপে চামচ নাড়তে লাগল বৃদ্ধা। 'তোমার চার্মিং ওয়াইফকে দেখছি না যে? এখনও ঘুমাচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।' গলা খাঁকারি দিল মাসুদ রানা। 'ওর ঘুম বেশি।'

'কিসের বেশি?' তেড়ে উঠল সে। 'এই বয়সে ঘুমাবে না তো কি বুড়ি হলে ঘুমাবে? আমার মত বয়সে? জানো, আজকাল ঘুম আমার একেবারেই হয় না? বুড়ো হলে ঘুম কমে যায় সবার, জানো? এটাই হচ্ছে আসল ঘুমের সময়, এই বয়সটা।'

ওদের কফি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘুম সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা চালিয়ে গেল বৃদ্ধা। তারপর সরে গেল অন্য প্রসঙ্গে। 'তোমরা চলেছ কোনদিকে, বাছা?'

'দক্ষিণে।'

'বুঝেছি, মায়ামি!' আপনমনে মাথা দোলাতে লাগল সে। 'ডিজনিল্যাণ্ড গিয়েছ কখনও? যাওনি! বিরাট মিস করেছ। আমি আর আমার স্বামী গত বছর গিয়েছিলাম বেড়াতে। ওখানে মিকি মাউসের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করেছি আমি, জানো? কল্পনা করতে পারো মিকি মাউসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি আমি?'

'এখানে থাকলে বক্ বক্ করে বুড়ি মাথাটা আমার বিগড়ে দেবে,' নিচু কণ্ঠে বলল বিল্লাহ। 'মাসুদ ভাই, চলুন কেটে পড়ি।'

একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট বৃদ্ধার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। 'কীপ চেঞ্জ।'

'থ্যাঙ্ক ইয়া, সানি! গড ব্লেস ইয়া!' খুশিতে চকচক করে উঠল বৃদ্ধার প্রকাণ্ড মুখটা।

বেরিয়ে এসে সঙ্গী দু'জনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে জরুরী কিছু আলোচনা করল মাসুদ রানা। কি করতে চায় ও জানাল। এক বাক্যে সম্মত হলো ফয়েজ ও বিল্লাহ। রুমে ফিরে

নাদিরার ঘুম ভাঙাল মাসুদ রানা। তৈরি হয়ে নিল সে। মোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। শহরের এক রেস্টুরেন্টে নাস্তা খেলো পেট পুরে, তারপর রওনা হয়ে গেল উত্তর-পশ্চিম দিকে।

হু-হু করে তীব্র গতিতে ছুটতে লাগল বুইক রিভেরা। মাথার ওপর প্রকাণ্ড এক কড়াইয়ের মত ঝুলে আছে কড়া সূর্য, গনগনে উত্তাপ ছড়িয়ে চলেছে নির্বিকার চিত্তে। দিনে এই, অথচ রাতে প্রচণ্ড শীত পড়ে। একে একে আলমা, হ্যাজেলহার্স্ট, ম্যাকরে এবং ইস্টম্যান ছাড়িয়ে এল ওরা। ম্যাকরে-তে আধঘণ্টা থেমেছিল ওরা নিজেদের এবং বুইকের পেট ভরার কাজে, তারপর আবার বিরামহীন চলা। প্রথমে গাড়ি চালাচ্ছিল ফয়েজ, ম্যাকরে-তে তাকে সরিয়ে মাসুদ রানা বসেছে হুইলে।

চলছে তো চলছেই ওরা, যেন শেষ নেই এ চলার, কোনদিন ফুরোবে না এ পথ। কোথায় চলেছে মাসুদ রানা, বুঝতে পারছে না নাদিরা। প্রশ্ন করে যে জেনে নেবে, সে ইচ্ছেও নেই। বসে আছে তো বসেই আছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। এর মধ্যে চার লেনের প্রশস্ত কংক্রিটের হাইওয়ে তিন লেনে এসে ঠেকেছে প্রথমে, তারপর দুই লেন, তারও পরে এক লেনে। এরপর নুড়ি আর আলকাতরার কার্পেটিং করা অমসৃণ, সরু রাস্তা ধরে ছুটল কিছুক্ষণ বুইক। সবশেষে এসে পড়ল দুটো গাড়ি কোনরকমে পাশ কাটাতে পারে, এমন এক সরু গ্রাম্য রাস্তায়। পিছনে ঘন ধুলোর চওড়া লেজ নিয়ে ছুটতেই থাকল বুইক।

একটার পর একটা ক্রসরোড টাউন পেরিয়ে যাচ্ছে ওরা, ওয়েস্টার্ন ছবিতে যেমন ছোট ছোট শহর দেখানো হয়ে থাকে, তার চার ভাগের এক ভাগও নয় এগুলো। দু'দিকে রং জ্বলে যাওয়া পুরানো ওভারলস পরা পুরুষ, সুতির পোশাক পরা মহিলা, খচ্চর টানা ওয়াগন, এবং হঠাৎ হঠাৎ এক আধটা ষাঁড় টানা

লাঙলের সাহায্যে কৃষকের জমি চাষ ইত্যাদি দেখতে দেখতে চলেছে ওরা। এদিককার মাটি একেবারে খটখটে শুকনো, মানুষগুলোও তাই। অতি খাটুনি সময়ের অনেক আগেই বুড়ো বানিয়ে ফেলেছে এদের। মেজাজ খিটখিটে করে তুলেছে।

যত্রতত্র থুথু ফেলছে এরা এবং অনবরত। ওদের দেখছে এমন দৃষ্টিতে, যেন পারে তো কাঁচা চিবিয়ে খায়। আরও একটা জিনিস লক্ষ করার আছে এসব ক্রসরোড টাউনে। পুরুষদের শতকরা প্রায় চল্লিশজনই একটা না একটা অঙ্গ হারিয়েছে। হয় একটা হাত অথবা এক পা নেই। ছেলে-কিশোরদেরও এক অবস্থা।

'ফার্ম মেশিনারী,' অন্যদের অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে বলল মাসুদ রানা। 'এ ধরনের অঙ্গহানির জন্যে দায়ী ট্রাক্টর, বাইণ্ডার অথবা থ্রেশার। কাজ করতে করতে কখন যে বিপদ ঘটে যায়, বোঝা মুশকিল।' একটু বিরতি। 'সন্ধে হয়ে এল প্রায়। এখানেই চেষ্টা করে দেখা যাক, কি বলো?'

কাউকে নির্দিষ্ট করে কথাটা বলেনি রানা, কাজেই বিল্লাহ-ফয়েজ দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল। 'সেই ভাল,' বলল ফয়েজ। শহরের একমাত্র গ্যাস স্টেশন থেকে বুইকের ট্যাঙ্ক ভরে নিল রানা। নাদিরা দেখল, স্টেশনের সামনে একটা টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছেগু হুইটার, জর্জিয়া।

'এখানে কেন এলাম আমরা, রানা?'

'কয়েকদিন থাকব বলে।'

বিস্মিত হলো নাদিরা। 'এখানে! এটা কোন থাকার জায়গা হলো?'

'সে জন্যেই তো এসেছি। আমরা এখানে আসতে পারি কল্পনাই করবে না কেউ। একটা ছাড়া কোন কিছু দুটো নেই

এখানে। গ্যাস স্টেশন, জেনারেল স্টোর, রেস্তোরাঁ, হার্ডওয়্যার স্টোর ইত্যাদি সবকিছু একটার বেশি দুটো নেই। এমন জায়গায় আমরা আছি ভাববেই না কেউ। এবং সেটাই আমি চাইছি।'

'মোটেল নেই কোন?'

'মোটেল! এখানে মোটেল আসবে কোত্থেকে?'

'তাহলে? থাকব কোথায় আমরা?'

'খুঁজে দেখতে হবে। এ ধরনের টাউনে সাধারণত বয়স্ক চিরকুমারী অথবা বিধবা পরিচালিত ট্যুরিস্ট অ্যাকোমোডেশন হাউস থাকে। "ট্যুরিস্টস ওয়েলকাম" অথবা শুধু "বোর্ডারস" সাইন ঝোলে সামনে।'

'যদি না থাকে?' সংশয় প্রকাশ করল নাদিরা।

'আছে।' নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'অন্তত একটা থাকতেই হবে।' ফুয়েলের দাম পরিশোধ করল ও। আবার গাড়ি ছাড়ল। পাঁচ মিনিট পর পাওয়া গেল বাড়িটা। প্রকাণ্ড, ছবির মত সুন্দর সাদা একটা বাড়ি। সামনের বড়সড় লনটা অসম্ভবরকম সবুজ। সামনে দুটো খুঁটির মাথায় ঝোলানো আছে একটা নোটিসগু ট্যুরিস্ট অ্যাকোমোডেশনস্–ডে, উইক, মানথ।

সামনের বিশাল পোর্চে রকিং চেয়ারে বসে আছে ঢ্যাঙামত এক বৃদ্ধা, দোল খাচ্ছে ধীরগতিতে। একভাবে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। হাতে একটা তাল পাতার পাখা, তাই দিয়ে থেমে থেমে বাতাস করছে নিজেকে। একটা গাড়ি সামনের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে, আমলই নেই। আসন ত্যাগ করা তো দূরের কথা।

'বুড়ি খুব দেমাগী মনে হচ্ছে!' বলল বিল্লাহ।

'চোখ দুটো লক্ষ করেছ, কেমন খাই খাই করছে?' মহিলার চরিত্র বিশ্লেষণ সম্পন্ন করল ফয়েজ।

‘নামো সবাই,’ বলল মাসুদ রানা। ‘ফয়েজ, তুমি খুঁড়িয়ে হাঁটো। বুড়িকে বোঝাতে হবে পায়ে ব্যথা পেয়েছ তুমি।’ খুলল আর দড়াম দড়াম বন্ধ হলো বুইকের তিন দরজা। রানা নামল শেষে। এয়ার কণ্ডিশনিং ব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে স্টার্ট বন্ধ করল না ও। দরজা লাগিয়ে নাদিরার এক হাত ধরল, পা বাড়াল সামনের দিকে। ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে পোর্চের দিকে এগোচ্ছে এখন। আগের মতই স্থির চোখে ওদের দেখছে বৃদ্ধা। ভীষণরকম ধীরস্থির। দুলুনি বন্ধ হলো না তার মুহূর্তের জন্যেও। সামান্য এদিক-ওদিক হলো না পাখার দোল।

আরও কাছে আসতে বোঝা গেল যথেষ্ট বয়েস হয়েছে মহিলার। কম করেও সত্তর। বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য হালকা-পাতলা। মুখটা কুড়ালের মত, চাউনি কঠোর। চওড়া কবজি। সুতির স্কার্ট ব্লাউজ পরে আছে মহিলা, মুখ চলছে সারাক্ষণ। কিছু চিবাচ্ছে সে। চুইংগাম, অথবা তামাক। পরে জেনেছে ওরা, আলকাতরার দলা চিবাচ্ছিল বৃদ্ধা। কে নাকি তাকে পরামর্শ দিয়েছে, ওই জিনিস সারাক্ষণ চিবালে দাঁত ঝকঝকে সাদা থাকে।

‘গুড আফটারনুন, ম্যাম।’ থেমে দাঁড়াল রানা বৃদ্ধার পাঁচ হাত তফাতে। হ্যাট নামিয়ে নড করল লম্বা করে। ফয়েজ আর বিল্লাহ ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

উত্তরে নড করল বৃদ্ধা অভিজাত ভঙ্গিতে। পাখা চালাতে লাগল ধীরগতিতে। ‘খুব গরম পড়েছে।’

‘ঠিক বলেছেন, ম্যাম,’ সায় দিল মাসুদ রানা। একটু সময় নিল। ‘আমার নাম স্যাম মরিসন। আর এ আমার স্ত্রী, মেরি। ওরা আমার দুই বন্ধু, ডিক আর রিচার্ড। ম্যাকন থেকে আসছি আমরা, দক্ষিণে যাব। পথে হঠাৎ রিচার্ড ব্যথা পেয়েছে পায়ে, ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে। মারাত্মক কিছু নয় অবশ্য।

ডাক্তার বলেছে কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে। তাই ভাবলাম এখানেই কোথাও থেকে যাই দু'দিন। নতুন জায়গাও দেখা হবে, সঙ্গে বিশ্রামও হবে ওর। আপনার এখানে যদি দুটো রূম পাওয়া যায়, খুব উপকার হয় আমাদের।'

কথা বলল না বৃদ্ধা। রকিং চেয়ারের দুলুনি বা হাত পাখা, দুটোই আগের মত চলছে একই তালে-ছন্দে। পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল রানা ও বৃদ্ধা। মাসুদ রানার মনে হলো, কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে যেন। চারদিক অসম্ভবরকম নীরব। মাঝেমধ্যে এক আধটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। বৃদ্ধার স্থির, পলকহীন চাউনি দেখে রানার কেন যেন মনে হলো, ও যে সত্যি কথা বলেনি, কিছু লুকাচ্ছে, তা সে ধরে ফেলেছে।

অবশেষে মুখ খুলল বৃদ্ধা। 'কি নাম বললেন আপনার? স্যাম মরিসন?'

'হ্যাঁ। আমার জন্ম ব্রিটেনে। তবে বহু বছর ধরে এ দেশে আছি। ম্যাকনে ছোটখাট একটা ইণ্ডাস্ট্রি আছে আমার। আর আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ি উত্তরে।'

এমনভাবে মাথা দোলাল বৃদ্ধা, যেন ব্রিটেন থেকে যারা এ দেশে আসে তাদের ম্যাকনে থাকাই স্বাভাবিক, এবং তারা সবাই অবশ্যই উত্তরে বিয়ে করে।

'প্রতিদিন দশ ডলার,' পাখা দোলাতে দোলাতে বলল বৃদ্ধা। 'মাথাপিছু। নাস্তা সরবরাহ করা হবে। তবে দুপুর ও রাতের খাবার টাউনে গিয়ে খেয়ে আসতে হবে আপনাদের। হক্সির রান্না খুব আহামরি কিছু নয়, তবে একেবারে মন্দও নয়। দিন কয়েক চালিয়ে যেতে পারবেন। রূমে রান্না করা চলবে না। আমার এখানে কোন হার্ড-লিকার নেই, রাখি না। যদি আপনারা চান,

রূমে বসে খেতে পারবেন, আমি বাধা দেব না। আইস কিউব প্রয়োজন হলে কিচেন রেফ্রিজারেটর থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। পার্লারে একটা টিভি আছে আমার, যদি দেখার ইচ্ছে হয়, দেখতে পারবেন।' এক চিলতে হাসির আভাস ফুটল যেন বৃদ্ধার পাতলা ঠোঁটের কোণে। 'ইউ আর ওয়েলকাম।' এখন আর আগের মত কঠোর মনে হচ্ছে না কুড়ালমুখো বৃদ্ধাকে। 'আমি মিসেস পার্ল হক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাম। বোঝা যাচ্ছে আপনার এখানে চৎমকার কাটবে আমাদের সময়।' পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল মাসুদ রানা।

'আমিও সেটাই আশা করব।'

পুরো সাত দিনের টাকা তার হাতে তুলে দিল রানা। বুড়ির কথাটার মানে কি? এমনিই বলল, না কিছু বোঝাতে চাইল? ভাবছে ও।

'বাড়ির পিছনে আমার গ্যারেজে আপনাদের গাড়ি রাখতে পারেন। গ্যারেজটা বেশ বড়। আমার পুরানো একটা প্লিমাউথ থাকে। আর থাকে কয়েকটা মুরগি, একটা বকরি, আর একটা হাউণ্ড। ওরা কোন সমস্যা করবে না।'

সম্ভাবনাটা প্রায় অবশ্যম্ভাবি, তবু জানতে চাইল রানা, 'মিস্টার হক...?'

'মারা গেছে। অনেক আগে।'

'শুনে দুঃখ পেলাম।'

যে রূম দুটো দেয়া হলো ওদের, অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর। খুব যে দামী বা দুর্লভ আসবাবে সাজানো তা নয়। তবে ও দুটো দেখলে পঞ্চাশ বছর আগের মধ্যবিত্ত গ্রাম্য মার্কিনীদের জীবনধারা, রুচি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

মোম পালিশ করা ঝকঝকে কাঠের ফ্লোর। প্রকাণ্ড জানালায় ঝুলছে ফিনফিনে সাদা কাপড়ের হাতে সেলাই করা পর্দা। ম্যাপেল কাঠের ফার্নিচার, এত স্বচ্ছ পালিশ করা যে চেহারা দেখা যায় আয়নার মত। স্পিণ্ডলের ওপরে বসানো খাট, ইচ্ছে করলেই ঘোরানো যায় যেদিক খুশি। চমৎকার প্রিন্ট ভেলভেটে মোড়া পুরু গদির আর্মচেয়ার। চার দেয়ালে ছোট বড় কয়েকটা করে বাঁধানো ফ্রেম ঝুলছে। কারও ছবি বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের নয়, ফার্নের পাতা ইস্ত্রি করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে ওতে।

সবকিছু এত সুন্দর করে সাজানো-গোছানো, এত পরিচ্ছন্ন যে মোহিত না হয়ে পারল না ওরা। বাতাসে ল্যাভেণ্ডারের মৃদু সুবাস ভাসছে। পাতলা পর্দা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকা পড়ন্ত রোদের আলো স্বপ্নীল করে তুলেছে পরিবেশ। ওদের দুই রূম লাগোয়া আরও তিনটে বড় আকারের বেডরূম আছে। একই ভাবে সাজানো-গোছানো। খালি সব।

পরিবেশের এমনই গুণ, বিপদ, শঙ্কা সব ভুলে গেল ওরা ঘরে পা দিয়েই। বুইক গ্যারেজে রেখে মালপত্র নিয়ে এল ওপরতলায়। নাদিরা নেই ওদের সঙ্গে। নিচের পোর্চে মিসেস হকের সঙ্গে জমে গেছে সে। 'মহিলা ওপরতলায় থাকেন না,' আধঘণ্টা পর ফিরে এসে জানাল নাদিরা। 'নিচতলার পার্লারে থাকেন, সোফায় ঘুমান।'

'কেন?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'বাত আছে পায়ে। আর্থ্রাইটিস। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয়, তাই। তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর। অনেক প্রশংসা করলেন তোমার।'

'আমার! বলো কি?'

'হ্যাঁ, খুব!'

‘অবিশ্বাস্য!’

‘খুব সরল সোজা মানুষ।’

‘তাই ভাবছ তুমি?’

‘কেন, তুমি অন্য কিছু ভাবছ নাকি?’

‘হ্যাঁ, ভাবছি।’

‘কেন?’

‘কেন? কারণ মিসেস হক মোটেই সরলসোজা নয়। বরং যথেষ্ট চতুর।’

চোখ কোঁচকাল নাদিরা। ‘যেমন?’

‘মহিলা খুব ভাল করেই টের পেয়ে গেছেন যে আমরা পালাচ্ছি। সে পুলিসের তাড়া খেয়েই হোক, বা আর যার তাড়া খেয়ে হোক।’

হাসি শুকিয়ে গেল মেয়েটির। ‘মানে?’ একটা ঢোঁক গিলল সে। ‘তা মিসেস হক বুঝলেন কি করে?’

‘খুব সহজ! আমি কি বলেছি ওঁকে, দক্ষিণে যাচ্ছি আমরা, এই তো? দক্ষিণে বলতে ফ্লোরিডা বোঝায় সাধারণত, যতক্ষণ না আর কোন স্থানের নাম উল্লেখ না করা হচ্ছে। এবং কোত্থেকে? ম্যাকন থেকে। ব্যাপারটা যদি সত্যিই হত, তাহলে হুইটারের ত্রিসীমানার মধ্যেও আসার কথা নয় আমাদের। সেক্ষেত্রে রুট ষোলো ধরে রুট পঁচানব্বইয়ের দিকে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল আমাদের। অথবা দক্ষিণে গিয়ে রুট পঁচাত্তর হয়ে পঁচানব্বই ধরে অরল্যাণ্ডো যাওয়া। অথচ তার কোনটাই না করে চলে এসেছি আমরা জর্জিয়া। রাতে সূর্য ওঠা যেমন অসম্ভব, এ-ও তেমনি। মহিলা আর যাই হোক, বোকা নয়। ভালই বুঝতে পেরেছে আমরা পালাচ্ছি, এবং আমাদের আত্মগোপনের উপযুক্ত জায়গা দরকার। অন্তত কিছুদিনের জন্যে।’

'তাহলে কেন…?'

'সোজা। টাকা চাই, অথবা মানুষের সঙ্গ চাই। যে কোন একটা, অথবা দুটোই হতে পারে এর কারণ। কথা বলার সময়ই তার চোখের দৃষ্টি বুঝিয়ে দিয়েছে আমাকে পরিষ্কার, আমার একটা কথাও সে বিশ্বাস করেনি। তবে…' জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা, অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে থাকল বাইরে। 'এটাও সে ভালই বুঝতে পেরেছে যে আমরা তার ক্ষতি করব না। তেমন খারাপ মানুষ আমরা নই। তাই থাকতে দিয়েছে। নইলে হাঁকিয়ে দিত। কে সাধ করে ঘাড়ে ঝামেলা নিতে চায়?'

'কিন্তু…কিন্তু যদি কাউকে জানিয়ে দেয় আমাদের কথা?'

মাথা নাড়ল মাসুদ রানা। 'না, তা-ও সে করবে না। আমরা যার লেজ-ই মাড়িয়ে থাকি, তাতে কিছু আসে-যায় না মিসেস হকের। কাজেই মুখ বন্ধ রাখবে সে। এদের প্রকৃতিই এমনি, যার যার নিজের ধান্ধায় থাকে। কাজটা যদি কেউ করে, টাউনের কেউ করবে, মিসেস হক নয়। সে যাক্, চলো নিচে যাই। ঘুরে ফিরে দেখে আসি জায়গাটা।'

নেমে এল ওরা। পোর্চে মিসেস হকের সঙ্গে দু'য়েকটা বাক্য বিনিময় করল রানা ও নাদিরা। অন্য দু'জন মুখ বুজে থাকল। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল বাড়ির সীমানার বাইরে। চারদিকের সৌন্দর্যের প্রাচুর্য দেখে মনে হলো রানার জীবনটা এখানে কাটিয়ে দেয়া গেলে মন্দ হত না। সূর্য ডুবতে বসেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। কুয়াশার চিহ্নও নেই কোথাও। খুব হালকা বাতাস বইছে। সারাদিনের অসহ্য গরমের পর বাতাসের শীতল পরশ দেহমনে স্বর্গীয় আবেশ ছড়িয়ে দিল সবার।

মাথার ওপর ফত্ ফত্ আওয়াজ শুনে চোখ তুলল ওরা। খাটো, মাথা বাঁকা তরবারির মত কালো একটা কি পাখি যেন,

গোল হয়ে ঘুরছে। রকেটের মত খাড়া হয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে, আবার একই ভাবে ডাইভ দিয়ে ফিরে আসছে আগের উচ্চতায়, ফের শুরু হচ্ছে তার চক্কর।

'চিকেন হক,' বলল ফয়েজ আহমেদ। 'বহুত বজ্জাত।'

পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। আরও দু'তিনবার ওপরে উঠল ওটা, গোঁত্তা খেয়ে নেমে এল। তারপর মিলিয়ে গেল। সামনে একটা বড়সড় জলাশয় দেখে সেদিকে এগোল ওরা। একটা সরু খাল, চওড়া বিশ ফুটের মত। পানি খুব ঘোলা, একেবারে কাদাগোলা রং। নাক কোঁচকাল নাদিরা, শব্দ করে শ্বাস টানল কয়েকবার। 'কিসের গন্ধ লাগছে না? কেমন কাদা কাদা গন্ধ?'

মাসুদ রানাও নাক টানল। 'ক্যাটফিশ। মাগুর-শিং, কাদার ভেতর গর্ত করে থাকে। কাদা খোঁচাখুঁচি করছে ওরা।'

সাত

সাড়ে সাতটায় ডিনারের জন্যে তৈরি হয়ে নেমে এল ওরা। পার্লার থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে এল মিসেস হক। 'টাউনে চললেন?'

'হ্যাঁ, ম্যাম,' বলল মাসুদ রানা। 'লম্বা জার্নির ফলে খিদে লেগে গেছে খুব। তেমনি পাচ্ছে ঘুম।'

'সোজা হক্সিতে চলে যান। হুইটারে হক্সিই যা একটু রাঁধতে পারে।'

'ধন্যবাদ।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। পাঁচ মিনিট ধুলো উড়িয়ে পৌঁছে গেল

শহরে। এটা পথে পেরিয়ে আসা অন্য শহরগুলোর থেকেও ছোট। গ্যাস স্টেশন ছাড়া একটা জেনারেল স্টোর, একটা হোটেল, একটা হার্ডওয়্যার স্টোর, একটা ব্যাংক, একটা লিকার স্টোর এবং হক্সি'স রেস্টুরেন্ট। ব্যস।

গেম কক আর হক্সি'স-এর গঠন প্রকৃতি অবিকল এক। যেন একই ডিজাইনারের কাজ। সেই উলঙ্গ কাঠের ফ্লোর, বার, টেবিল-চেয়ার, বুদ, পিছনের কিচেন, খাড়া কফিন, ফোন বুদ, সব একরকম। ভেতরের মশলার ঝাঁঝও। কেবল একটা জিনিস নেই এখানে, ভেনডিং মেশিন, এবং পাবলিক বুদ একটা কম। গেম ককের মতই, ওরা ভেতরে ঢুকতে উপস্থিত অন্যদের আলাপ-হাসাহাসি বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওদের প্রত্যেকে। দলটা একটা বুদে ঢুকে পড়তেই আবার নিজেদের ফিরে পেল তারা।

এদের ওয়েট্রেসের সঙ্গে আগেরটার পার্থক্য কেবল বয়সের। চার-পাঁচ বছর বেশি হবে এর বয়স। একটু মোটাও। তবে বেশ হাসিখুশি। 'ইভনিন, ফোকস,' দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি। 'ড্রিঙ্কিন, ইটিন, অর বোথ? আমি রোজ।'

'বোথ,' পাল্টা দাঁত দেখাল মাসুদ রানা। 'প্রথমে ভদকা দাও, বরফসহ। তারপর তোমাদের মেন্যুতে চোখ বোলাব, অবশ্য যদি থাকে।'

'অবশ্যই আছে! থাকবে না কেন?' চোখ পাকাল রোজ। 'যা-তা ভেবেছ নাকি আমাদের? রাখ, উত্তর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।'

প্রপিতামহের আমলে ছাপানো চারটা মেন্যু দিয়ে গেল ওদের রোজি। তেল-মশলা আর হাতের ময়লায় লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে, ভাল করে পড়া যায় না সব। কাগজগুলো দেখে মনে হয়

কোন মেমো প্যাড থেকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে বুঝি। যেমন ময়লা, তেমনি মলিন। মলাটে লেখাগু হক্সি'সগু হোয়্যার দি এলিট মীট টু ইট।

প্রথম আইটেম সুপ। তারপর ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার। মিট। স্যালাড। পটস অ্যাণ্ড ভেজিটেবলস। আইসক্রীম অর জেল্লো। কফি। আইটেমগুলোর বিশদ এন্ট্রিতে চোখ বোলাতে লাগল ওরা। মলাটের নিচে বড় করে একটা সতর্কবাণীগু ডোন্ট টেক দিস মেন্যু ফর আ স্যুভেনিয়ার।

'খুব খারাপ,' ওটা পড়ে মন্তব্য করল ফয়েজ। 'স্মৃতির অ্যালবামে রাখব বলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।'

ভদকা নিয়ে এল রোজ। প্যাড-পেন্সিল নিয়ে রানা ও নাদিরার দিকে তাকাল। 'ক্যাটফিশ বল্স্ কি জিনিস?' জিজ্ঞেস করল নাদিরা।

'গোল করে কাটা ক্যাটফিশের মাংস, ডীপ ফ্রাইড। খেতে দারুণ! সঙ্গে সুপ।'

'কিসের সুপ?' মুখ তুলল মাসুদ রানা।

'টম্যাটো। এ অঞ্চলের সেরা সুপ।'

'ব্রেডেড ভীল কাটলেট?'

'ডিল-লিশিয়াস!'

'ভীল খুঁজে পাওয়া যাবে তো ওতে?'

'ওয়েল, কিছু না কিছু পাবে।'

টম্যাটো সুপ, কাটলেট, ক্যাটফিশ বলস্, ভেজিটেবলস্, বীন অর্ডার দিল ওরা। গলা পর্যন্ত খেলো সবাই। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হওয়ার জোগাড় হয়েছিল, কাজেই রান্নার স্বাদ নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ। তবে মন্দ নয় রান্না, ভালই লাগল খেতে। এরপর আইসক্রীম। এবং সবশেষে কফি। কফি রেখে বেরিয়ে

যাচ্ছিল রোজ, রানার প্রশ্ন শুনে থেমে দাঁড়াল।

'বারের ওপাশের লোকটি বুঝি হক্সি?'

'নাহ্। হক্সি ওর মত গাধা না, বুদ্ধি রাখে সে মাথায়। রাখে বলেই এটা বেচে দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় সটকে পড়েছে। নামটা ইচ্ছে করেই বদলাইনি আমরা।'

'কি নাম ওর?'

'হাইম গোর।'

'তোমার একমাত্র প্রেমিক?' হাসল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, ও তাই ভাবে বটে,' রোজও হাসল।

'তোমার কথা শোনে গোর?'

ভুরু কোঁচকাল মেয়েটি। 'শুনবে না মানে? কিন্তু বিষয়টা কি, মিস্টার?'

'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে আমাদের জন্যে।' ওয়ালেট থেকে গুণে গুণে আড়াইশো ডলার বের করল মাসুদ রানা। 'এটা রাখো, অ্যাডভান্স। কাজ শেষ হলে আরও আড়াইশো পাবে।'

প্রকাণ্ড এক ঢোক গিলল রোজ। চোখ কপালে তুলে চেয়ে থাকল নোটগুলোর দিকে। লোভ, সন্দেহ, ভয় ইত্যাদি ভাবের খেলা চেহারায়। 'কাজটা কি, মিস্টার?'

'কঠিন কিছু নয়। খুব সহজ কাজ। ধরো এটা।'

কাঁপা হাতে টাকাগুলো নিল রোজ। এদিক ওদিক, বিশেষ করে হাইম গোরের দিকে তাকাল একবার আড়চোখে। তারপর চট করে ব্লাউজের ভেতর পুরে ফেলল। 'বলুন, কি করতে হবে আমাকে।'

নিচু গলায় এক মিনিট কথা বলল মাসুদ রানা। ওর কথা শেষ হতে আবার ভুরু কোঁচকাল সে। 'ব্যস! আর কিছু না?'

‘তুমি নিশ্চই স্বীকার করবে কাজের তুলনায় ফী-টা অনেক বেশি দিচ্ছি আমি?’

‘স্বীকার না করলে কি প্রশ্নের উত্তর অন্যরকম হতে পারে আশঙ্কা করছেন আপনি?’ হাসল রোজ। ‘এ কাজে এত টাকা অবিশ্বাস্য। ভাববেন না, মিস্টার। খবরটা সময় থাকতে পাবেন। অবশ্য যদি ঘটে তেমন কিছু।’

‘গুড। হ্যাঁ, তোমাদের রান্না ভালই লাগল।’

হাসিটা আরও বিস্তার লাভ করল মেয়েটির। ‘মিথ্যে বলার আর্ট আপনি খুব ভালই জানেন।’

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, মন্থর গতিতে রওনা হলো মিসেস পার্ল হকের বাড়ির দিকে। ‘মেয়েটিকে বিশ্বাস করো তুমি?’ প্রশ্ন করল নাদিরা।

‘না করে উপায় কি? আমাদের খোঁজাখুঁজি করা হলে গোরই প্রথম জানতে পারবে। গোর জানা মানেই রোজ জানা। তাছাড়া, আমার মনে হয়েছে, মেয়েটিকে বিশ্বাস করলে ঠকব না আমরা।’

পোর্চে রকারে বসে আছে মহিলা। চাঁদের আলোয় হাসছে যেন হুইটার। পরিষ্কার নীল আকাশ। নুড়ি বিছানো ড্রাইভওয়েতে গাড়ি রেখে নেমে এল ওরা। মাসুদ রানার হাতে বাদামী কাগজের একটা প্যাকেট। বেশ বড় প্যাকেটটা। বারোটা ঠাণ্ডা বীয়ারের ক্যান আছে ওতে।

‘ইভনিং, ম্যাম।’ সঙ্গীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল নাদিরা। ‘কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে, তাই না?’

মুচকে হাসল কুড়ালমুখো মিসেস হক। মাথা দোলাল, ‘হ্যাঁ। সে জন্যেই বাইরে এসে বসেছি। খুব ভাল লাগছে। তোমরা বসতে চাইলে বসতে পারো।’

ওপাশে দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে কয়েকটা পোর্চ চেয়ার, নিয়ে

এসে মহিলাকে ঘিরে গোল হয়ে বসল ওরা। 'আমরা স্মোক করলে আপনার অসুবিধে নেই তো, মিসেস হক?' বলল রানা।

'না। ধূমপানের অভ্যেস আছে আমারও। তবে কম।'

নাদিরা ছাড়া আর সবাই সিগারেট ধরাল। বৃদ্ধাকে সাহায্য করল রানা সিগারেট ধরাতে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ধরে ওটায় চুমুক দিতে লাগল মহিলা। ভঙ্গি দেখে মনে হয় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। বোঝা গেল পরিবেশটা খুব উপভোগ করছে সে। খুশিই হয়েছে ওদের সঙ্গ পেয়ে। ঠিকই ধারণা করেছিল রানা, ভাবল নাদিরা, মানুষের সঙ্গ চাইছিল বৃদ্ধা, টাকাটা মুখ্য ছিল না।

'হক্সি থেকে কয়েক ক্যান বীয়ার এনেছি আমরা। আপনি আমাদের সঙ্গে পান করলে খুব খুশি হব।' প্যাকেটটা হাঁটুর ওপর রাখল মাসুদ রানা। প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকল মহিলার দিকে।

'নিশ্চই! ধন্যবাদ।'

কয়েক সেকেণ্ড পর। বাডওয়েইজারের ঠাণ্ডা ক্যানে চুমুক দেয়ার ফাঁকে ধূমপান করতে লাগল ওরা। এটা ওটা নিয়ে আলাপ করছে। এক সময় দেখা গেল, নিজের জীবন কাহিনী শুরু করে দিয়েছে মিসেস হক, ওরা শুনছে মন দিয়ে। তার বলার ব্যগ্রতা দেখে মনে হয় যেন ওদের এসব শোনাবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সে।

জানা গেল, আলবামার এভারগ্রীনের মেয়ে মিসেস পার্ল হক। আমেরিকার রাজ্যগুলো সে সময়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তখনই হুইটারে এসে বসবাস শুরু করে তার স্বামী, অ্যারনের পরিবার। অ্যারন ছিল বাবা-মার বড় ছেলে। জর্জিয়ার এথেন্সে এক চার্চ কনভেনশনে পরিচয় হয় পার্ল-অ্যারনের। পরিচয় থেকে প্রণয়। বেশ কিছুকাল পত্র বিনিময় চলে তাদের।

তারপর একদিন জর্জিয়া ছেড়ে আলবামা রওনা হয় অ্যারন, পার্লের পরিবারের কাছে, তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে।

এর এক বছর পর এভারগ্রীনে বিয়ে হয় তাদের, এবং স্বামীর সঙ্গে হুইটারে চলে আসে পার্ল। অ্যারনের মা বেঁচে ছিল তখন। মহিলার সঙ্গে বনিবনা হত না পার্লের, প্রায়ই এটা-ওটা নিয়ে খিটিমিটি লেগে থাকত। এই পর্যায়ে এসে বিরতি দিল বৃদ্ধা। অন্যমনস্কের মত চেয়ে থাকল সামনের দিকে। তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'মহিলা মারা গেছেন। তাঁর ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে চাই না আমি। তাঁর ভাল-মন্দ, সবকিছু সঙ্গে নিয়ে গেছেন তিনি। মৃতদের সমালোচনা করলে তাঁদের আত্মা কষ্ট পায়।'

আরেকটা ক্যানের ট্যাব খুলে তার হাতে ধরিয়ে দিল মাসুদ রানা। হাসির ভঙ্গি করল মহিলা। 'থ্যাঙ্কস, সানি।' লম্বা এক চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে গিলল পানীয়টুকু। আবার শুরু হলো কাহিনী।

দুই ছেলে, চার মেয়ের জন্ম হয় অ্যারন-পার্লের সংসারে, আট বছরের মধ্যে। প্রথম ছেলে, জন্মের পর পরই মারা যায়। তার পরের মেয়ে, সে-ও মারা যায় শ্বাসকষ্টজনিত রোগে, তিন মাস বয়সে। পরে ছোট ছেলেটিও মারা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নৌ-বাহিনীর পাইলট ছিল সে। জাপানে বোমা ফেলার সময় বিধ্বস্ত হয় তার বিমান। অবশিষ্ট তিন মেয়ে স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘরকন্না করছে শিকাগো, অ্যারিজোনা আর টরোন্টোয়।

এগারো নাতি-নাতনীর নানী মিসেস পার্ল। আগে মাঝেমধ্যে মেয়েরা স্বামীদের নিয়ে বেড়াতে আসত, কিন্তু এখন আর আসে না। তবে চিঠি লেখে নিয়মিত। নাতি-নাতনীদের ছবি পাঠায়, বৃদ্ধার জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছা কার্ড, গিফট পাঠায়।

‘ওদের এবারের বড়দিনের উপহারও পেয়েছি। জমিয়ে রেখেছি সব। বড়দিনের দিন সকালে গির্জা থেকে ফিরে খুলব।’

নীরবে কেটে গেল কয়েক মিনিট। চুপ করে বসে আছে সবাই। চাঁদের আলোর মোহনীয় রূপ দেখছে।

‘আপনার নিজের পরিবারের কেউ নেই?’ নরম গলায় জানতে চাইল নাদিরা।

‘না। কেউ নেই? সবাই চলে গেছে। আমি ছিলাম পরিবারের একমাত্র সন্তান। বাবা-মা মারা গেছে অনেক আগে। তারপর চাচা-চাচী, মামা-মামী, তাদের ছেলে-মেয়েরা, সবাই। দুই চাচাতো ভাই অবশ্য বেঁচে আছে এখনও, যতদূর জানি। কিন্তু কোথায় থাকে তারা, কি করে কিছুই জানি না। তারাও হয়তো জানে না আমার কথা। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।’

মাথা দোলাল নাদিরা। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। ‘হ্যাঁ। হয় এরকম।’

‘কি জানি!’ চিন্তিত, অন্যমনস্ক মনে হলো বৃদ্ধাকে। ‘কম তো দেখলাম না জীবনে। কিন্তু একটা পরিবার এত তাড়াতাড়ি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, আর কোথাও দেখিনি আমি। শুনিওনি। চোখের সামনে এখনও ভাসে, ওরা ছিল, অনেকেই ছিল। সংসার আলো করে ছিল। এখন কেউ নেই। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সব।’ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মিসেস হক। ‘কেউ থাকে না। এটাই নিয়ম। মানুষ আসে কেবল চলে যাওয়ার জন্যে। অথচ আমি? আটাত্তর বছর বয়স আমার, পৃথিবীকে দেয়ার মত অবশিষ্ট কিছুই নেই। যা ছিল, অনেক আগেই দিয়ে অবসর নিয়েছি। তবু বেঁচে আছি আমি। অথচ দেখো, যাদের বয়স ছিল, ক্ষমতা ছিল পৃথিবীকে কিছু দেয়ার, তাদের কেউ নেই। কী আজব খেলা ঈশ্বরের! মাঝেমধ্যে তাঁকে বড্ডো খেয়ালী মনে হয় আমার। কেন

যে এমন উল্টোপাল্টা করেন, ভেবে পাই না। যার সময় হয়নি, তাকে ছিনিয়ে নেন। আর যার কাজ ফুরিয়ে গেছে অনেক আগেই, তাকে ফেলে রাখেন।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল সবাই। মনটা কেমন করে উঠল মাসুদ রানার। পৃথিবীর আরেক প্রান্তের অজানা-অচেনা এক গ্রাম্য বৃদ্ধার দুঃখে বুকের ভেতরটা টন টন করছে।

'আসলে,' অনেকক্ষণ পর বলে উঠল নাদিরা, মৃদু কণ্ঠে। 'সময় বদলে গেছে, মিসেস হক। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে মানুষের জীবনও ওলোটপালট হয়ে গেছে। আগে যা স্বাভাবিক ছিল, এখন তা স্বাভাবিক নেই।'

'বুঝি। কিন্তু মেনে নিতে পারি না। দেখ, এত বড় একটা বাড়িতে ভূতের মত একলা পড়ে থাকি আমি। গ্রামের এক মহিলা সপ্তায় একবার আসে, ঘরদোর ঝাড়মোছ করে দিয়ে যায়। ও ছাড়া মাঝেমধ্যে যদি এক-আধজন ট্যুরিস্ট এল তো ভাল, নয়তো একাই থাকতে হয় আমাকে মাসের পর মাস। কথা বলার একজন সঙ্গীও নেই। অথচ ইচ্ছে করলে আমার তিন মেয়েই সপরিবারে থাকতে পারে আমার সঙ্গে। নাতি-নাতনীদের নিয়ে সময় কাটাতে পারি আমি। প্রচুর জমি আছে আমার, চাষ-বাস করে রাজার হালে চলতে পারবে ওরা, অথচ আসবে না।

'শহরে কাজ করতে করতে নাকমুখ দিয়ে রক্ত ছোটাবে, ভেজাল খেয়ে আয়ু কমাবে। তবু গ্রামে আসবে না। তোমরা অল্প বয়সী, রক্ত গরম, তোমরা মেনে নিতে পারো এ সব, আমি পারি না। ওখানেই কষ্ট। তোমরা এসেছ বলে ভালই লাগছে আজ আমার। খুব ভাল লাগছে।' ক্যানটা শেষ করল বৃদ্ধা। আরেকটা সিগারেট ধরাল রানার বাড়ানো প্যাকেট থেকে। পরমুহূর্তে বুড়ির প্রশ্ন শুনে চেয়ার উল্টে পড়ার দশা হলো ওর।

‘পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছ?’ সরাসরি মাসুদ রানার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল মিসেস হক।

‘জ্বি!’ শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল ওর।

‘কাদের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছ, পুলিস, না আর কারও?’

নড়ছে না কেউ একচুল। জমে গেছে সবাই যার যার আসনে। মাসুদ রানার ধারণা যে কতটা নির্ভুল, বুঝতে পেরে ভড়কে গেছে নাদিরা। গেল বুঝি ছুটে এত সুন্দর একটা আশ্রয়, ভাবছে সে। এখনই বোধহয় আবার গাট্টি-বোঁচকা গোল করতে হবে। কিন্তু নাদিরা জানে না, আরও কত চমক অপেক্ষা করছে সামনে। ওদিকে ভাষা হাতড়াচ্ছে মাসুদ রানা।

‘গাড়ি থেকে নামানোর সময় একটা সুটকেসের গায়ে ফুটো দেখেছিলাম তখন। কিসের ফুটো ওটা, বুলেটের না?’

এবারও মুখ খুলল না কেউ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বৃদ্ধা উত্তরের আশায়। তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ‘ঠিক আছে, বলতে হবে না। আর আমি কিছু একটা সন্দেহ করেছি বলে দুশ্চিন্তাও করতে হবে না। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো এখানে তোমরা, যতদিন খুশি। তোমাদের উপস্থিতি ভাল লাগছে আমার। তারচেয়েও বড় কথা, আমার মন বলছে তোমরা অন্যায় কিছু করোনি। যারা অপরাধী, তাদের চেহারা দেখেই চিনতে পারি আমি। তোমাদের কারও মধ্যে সেরকম কিছু নেই। সে জন্যেই তোমাদের থাকতে দিতে কোন আপত্তি নেই আমার। থাকো তোমরা। আর হ্যাঁ, কাল থেকে আর টাউনে যেতে হবে না তোমাদের। আমার এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবে। নতুন মানুষ দেখলে সন্দেহ করবে মানুষ, ফাঁস হয়ে যেতে পারে খবরটা।

‘আর তুমি,’ ফয়েজের দিকে তাকাল মিসেস হক। ‘সত্যি

রিচার্ড বা মিথ্যে রিচার্ড, যা-ই হও, একদম অভিনয় করতে পারো না তুমি। অভিনেতা হিসেবে থার্ড ক্লাসও নও। খামোকা খোঁড়ার অভিনয় করতে হবে না আর। আমি জানি পায়ে কিছুই হয়নি তোমার।' হাসি ফুটল বৃদ্ধার কুড়াল মুখে। 'এই খুঁড়িয়ে হাঁটো, পরক্ষণেই দেখি সোজা হয়ে হাঁটো।'

মুখ ঘুরিয়ে প্রথমে নাদিরা, পরে মাসুদ রানার দিকে তাকাল সে। 'চমৎকার বীয়ারের জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে, সানি। আমি চলি, ঘুম পাচ্ছে খুব। তোমরা বোসো যতক্ষণ মন চায়।' ওরা কেউ কিছু বলল না। বলার মত খুঁজে পেল না কিছু। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পার্লারে গিয়ে ঢুকল বৃদ্ধা।

টানা পাঁচ মিনিট পর নীরবতা ভঙ্গ করল নাদিরা। 'সাংঘাতিক মহিলা তো!'

মাসুদ রানা কোন মন্তব্য করল না, ঠোঁট টিপে হাসল কেবল।

'ফয়েজই আসলে ডুবিয়েছে,' বলল মুত্তাকিম বিল্লাহ। 'খোঁড়ানোর অভিনয় আমি করলে কিছুতেই ধরতে পারত না মহিলা।'

'ওরে আমার ইয়েরে!' তেড়ে উঠল ফয়েজ আহমেদ। 'বড় আমার হেনরি ফণ্ডা এসেছেন! সুটকেসের ছেঁদাটা দেখানোর সময়...'

'থামো তোমরা,' বলল মাসুদ রানা। 'তোমরা কেউ দায়ী নও এ জন্যে। ওসব পরের ঘটনা। আসলে আমরা এখানে আসামাত্রই মহিলা ব্যাপারটা আঁচ করেছে। বুঝে ফেলেছে ভেতরে কোন ব্যাপার আছে। আমি যে মিথ্যে বলছি, তখনই টের পেয়েছে সে, অথচ ভান করেছে যেন বোঝেনি।'

হাঁ হয়ে গেল বিল্লাহ। 'অ্যাঁ?'

'আপনি জানতেন?' জানতে চাইল ফয়েজ।

'জানতাম।'

'কি করে? মানে...'

'কঠিন কিছু নয় কাজটা। মাথা খাটালে তোমাদেরও বুঝতে অসুবিধে হবে না।' নাদিরাকে যা বলেছিল, কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল মাসুদ রানা। 'অতএব বুঝতেই পারছ, ভুল যা করার, করেছি আমি। আমিই দায়ী এ জন্যে।'

আবার চুপ হয়ে গেল ওরা। চিন্তিত।

'মহিলার কথা তো সবাই শুনলে তোমরা, কাজেই তাকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই,' ওদের আশ্বস্ত করল রানা। 'আমাদের ব্যাপারে মুখ খুলবে না মিসেস হক। কাজেই ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিন্তে ভাবতে পারি এখন আমরা। কাল সকালে বেরুব আমি।'

'কোথায় যাবে?' পরিষ্কার উদ্বেগ নাদিরার কণ্ঠে।

'জ্যাকসনভিল যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

'কেন?'

'প্রথম কাজ বুইকটা খালাস করে আরেকটা গাড়ি জোগাড় করা। হার্ডিভিলে গাড়িটা চোখে পড়ে গিয়েছিল রবার্টোর, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার মুখস্থ করে রেখেছে কি না, কে জানে। তোমরাও অবশ্য যাচ্ছ আমার সঙ্গে, কিছুদূর পর্যন্ত।'

'মানে!' হতভম্ব দেখাল মেয়েটিকে। ফয়েজ আর বিল্লাহও তাকিয়ে আছে।

'চিন্তাটা হঠাৎ করেই মাথায় এল, মিসেস হকের নিশ্চয়তা পাওয়ার পর।'

'কি সেটা?'

'এতক্ষণে হুইটারের প্রায় সবাই জেনে গেছে আমাদের এখানে আসার কথা, মিসেস হকের বাড়িতে ওঠার কথা। ছোট্ট শহর, কয়জনই বা থাকে এখানে, কানে কানে ছড়িয়ে গেছে

কথাটা। তাই ঠিক করেছি, সবাইকে কাল সকালে আমরা দেখাব যে আমরা চলে যাচ্ছি হুইটার ছেড়ে। এখানে থাকছি না আমরা।'

'তাতে লাভ?'

'সোজা। কেউ যদি আমাদের খোঁজ জানতে আসে টাউনে, সবাই বলবে আমরা এসেছিলাম। এক রাত থেকে আবার চলে গিয়েছি।'

'অথচ?'

'অথচ আসলে আমরা যাইনি। এখানে ছিলাম, এবং আছি। ব্র্যানসউইক পর্যন্ত এক সঙ্গে থাকব আমরা। ওখান থেকে আরেকটা গাড়ি ম্যানেজ করে সন্ধের দিকে হুইটার রওনা হবে তোমরা, যাতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। তোমাদের ফিরে আসা কারও চোখে না পড়ে। আর আমি ওখান থেকে বুইক নিয়ে চলে যাব। জ্যাকসনভিলের কাজ সেরে ওটা ওখানকার কোন হোটেলের সামনে রেখে ফিরে আসব।'

'জ্যাকসনভিলে কি কাজ তোমার?'

'প্রথম কাজ একটা প্লেন চার্টার করা, মনট্রিয়ল অথবা অটোয়া পর্যন্ত। যদি সেটা সম্ভব হয়, তাহলে কয়েকটা পাথর বিক্রি করতে হবে। কারণ ওদের অ্যাডভান্স দিতে হবে। অথচ এদিকে টাকা তেমন নেই। প্লেন চার্টার করা গেলে অনেক সহজে এবং নিরাপদে তোমাকে এ দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তা যদি কোন কারণে সম্ভব না হয়, একটা কিল্ন্ কিনে নিয়ে ফিরে আসব আমি।'

'কিল্ন্ কি জিনিস?' প্রশ্ন করল ফয়েজ।

'সোনা গলানোর ইলেক্ট্রিক চুল্লি।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। বিল্লাহ আর ফয়েজের দিকে তাকাল। 'পরশু রাত বারোটা ডেডলাইন। তার মধ্যে যদি ফিরে না আসি, বুঝবে গোলমাল হয়ে

গেছে। এক মিনিটও দেরি না করে সরে পড়বে তোমরা। যদি দেখো রবার্টোকে বাধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, এসওএস কল পাঠাবে শওকতকে। তারপর যা করার ও করবে।'

নড়াচড়া ভুলে বসে আছে ফয়েজ আর বিল্লাহ। এসওএস অর্থ চূড়ান্ত আঘাত হানার নির্দেশ, ওরা জানে। নিউ ইয়র্ক এজেন্সির বারোজন বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ এজেন্ট বেরিয়ে আসবে তাদের গোপন আস্তানা ছেড়ে। এজেন্সির সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য। তারা ডন পাওলো গার্সিয়াকে যে ভাবে হোক, আটক করবে জিম্মি হিসেবে। প্রয়োজনে তার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মারাত্মক ক্ষতি করে হলেও বাধ্য করবে তাকে রবার্টোকে ফিরিয়ে নিতে।

মাফিয়া আর যা-ই হোক, জাত ব্যবসায়ী। যেখানে বুঝবে লাভ নেই, সেখানে পা-ও এগোয় না ওরা। কাজেই ডন পাওলা যখন দেখবে প্রকাশ্যে সশস্ত্র লড়াইয়ে গড়িয়েছে বা গড়াতে যাচ্ছে ব্যাপারটা, একটা ব্যবসা বাঁচাতে গিয়ে রবার্টো তার আর দশটা ব্যবসাকে মারাত্মক হুমকির মুখে নিয়ে ফেলেছে, লোকসানের পাহাড় জমতে যাচ্ছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, নিউজ মিডিয়ার মাধ্যমে তার পুত্রধনের কীর্তি ফাঁস হয়ে মারাত্মক কেলেঙ্কারি ঘটাতে চলেছে, তখন নিঃসন্দেহে রবার্টোকে ফিরে আসতে বাধ্য করবে সে।

জানা কথা, এই বিপদে ডন পাওলোকে সাহায্য করতে অন্য ডনদের কেউ এগিয়ে আসবে না। কারণ তাদের সঙ্গে পাওলোর সম্পর্ক বর্তমানে খুব খারাপ। তারা বরং দূর থেকে মজা দেখবে, প্রতিদ্বন্দ্বী একজন কমে যাক, মনে মনে তাই চাইবে।

যেন বহু দূর থেকে কথা বলছে, এমনভাবে বলল ফয়েজ, 'মালপত্র, আর্মস সব কি করব? সঙ্গে নিয়ে যাব?'

'সুটকেসগুলো নিয়ে যাব শুধু। আর সব বাড়ির সামনের ওই খালের পাশে মাটির নিচে পুঁতে রেখে যাব ভাল একটা জায়গা

দেখে। রাত আরও গভীর হোক, তারপর।' চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা।

ব্যাপারটা লক্ষ করল ফয়েজ। 'আর কিছু?'

নাদিরার দিকে ফিরল ও। 'আমি টেলিফোন করে তোমাকে চাইতে পারি। হয়তো বলব, সব কিছু নিয়ে অমুক জায়গায় চলে এসো, কোন অসুবিধে নেই। সেক্ষেত্রে যদি কেবল নাদিরা সম্বোধন করি, তাহলে বুঝবে সত্যিই সব ঠিক আছে। আর যদি নামের আগে মিস যোগ করি, বুঝবে ঘাড়ে পিস্তল ঠেসে ধরে টেলিফোন করানো হচ্ছে আমাকে দিয়ে। সেক্ষেত্রেও এসওএস কল পাঠাবে তোমরা।' শেষ বাক্যটা ফয়েজ আর বিল্লাহর উদ্দেশে বলল ও।

পাথর হয়ে বসে থাকল নাদিরা। এতক্ষণ ভুলেই ছিল যেন কী মারাত্মক বিপদে জড়িয়ে ফেলেছে সে এই সিংহ হৃদয় যুবককে। কত বড় এক হুমকির মুখে এনে ফেলেছে মাসুদ রানা এবং তার সঙ্গীদের। বুক কেঁপে উঠল নাদিরার, যদি কিছু ঘটে যায় মাসুদ রানার? আর ভাবতে পারল না সে, বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেছে দৃষ্টি। বুকের ভেতর শুরু হয়ে গেছে অজানা আবেগের উন্মত্ত মাতামাতি।

'রানা, একটা কথা বলব?' কোন রকমে উচ্চারণ করল সে।

'অবশ্যই! বলো।'

'মালপত্র যা আছে, সব ফিরিয়ে দিই আমরা রবার্টোকে। তাহলে নিশ্চই আমাদের পিছু লাগা বন্ধ করবে ও। ফিরে যাবে।'

'যাবে না। তুমি বন্ধু সেজে ওকে বোকা বানিয়েছ, আমি ওর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছি। কাজেই আমাদের রক্ত দিয়ে গোসল না করা পর্যন্ত রবার্টো শান্ত হবে না। নো ওয়ে, নাদিরা। তুমি ওকে ছেড়ে দিলেও আমি ছাড়ব না। রবার্টো গার্সিয়ার ধ্বংস না

দেখা পর্যন্ত শান্তি পাব না আমি।’

আট

গভীর রাত। পা টিপে টিপে নিচে নেমে এল ওরা সবাই। মাসুদ রানা, বিল্লাহ ও ফয়েজ, সবার হাতে একটা পুঁটলি। নাদিরার হাত খালি। বেরিয়ে এল ওরা সাবধানে দরজা খুলে। ওটা আলতো করে ভিড়িয়ে দিয়ে গ্যারেজের দিকে চলল। গ্যারেজে একটা খন্তা দেখেছিল ফয়েজ গাড়ি রাখার সময়, ওটা দরকার।

কয়েক পা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল দলটা, পথ আগলে শুয়ে আছে প্রকাণ্ড এক হাউণ্ড। জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে ওদের। ছোট করে একটা হাঁক ছাড়ল ওটা। চট করে দু’পা পিছিয়ে এল নাদিরা। ‘ভয় পেয়ো না,’ বলল মাসুদ রানা। ‘আমি সামলাচ্ছি ওকে।’ এগোল ও ধীর পায়ে।

কান খাড়া হয়ে গেল হাউণ্ডের, জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে শব্দ করে, সন্দেহ ভরা চোখে দেখছে সে রানাকে, দ্বিধান্বিত। কয়েক ঘণ্টা আগে এই মানুষটার সঙ্গে মোটামুটি আলাপ পরিচয় হয়েছে তার। তখন তো বেশ ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছিল, ভাবছে হয়তো হাউণ্ড, এখন দেখি চোরের মত আচরণ করছে! কি ওগুলো ওদের হাতে? আবার হাঁক ছাড়তে গেল হাউণ্ড, কিন্তু সামলে নিল শেষ পর্যন্ত, অতি পরিচিত একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে। শিস বাজাচ্ছে লোকটা তাকে উদ্দেশ করে, নিঃশব্দ শিস। শব্দটা কেবল কুকুরেরাই শুনতে পায়। অভয়বাণী ও বন্ধুত্বের আহ্বান পাওয়া যাচ্ছে ওতে।

গলে গেল সারমেয়র আওলাদ। ঘন ঘন লেজ নাড়তে নাড়তে

উঠে এল। খুশিতে হাত চেটে দিল মাসুদ রানার। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল রানা। এই ফাঁকে দ্রুত কাজ সারল ফয়েজ, নিয়ে এল জিনিসটা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে খালপাড়ে পৌঁছে গেল ওরা। চাঁদ হেলে পড়েছে তখন, গাছপালার আড়ালে চলে গেছে। আবছা অন্ধকারে দ্রুত কাজে লেগে পড়ল ওরা।

জায়গা বাছাই করে প্রথমে কয়েক চাপড়া আস্ত মাটি তুলল বিল্লাহ ঘাস সমেত, তারপর তিন হাত গর্ত করে বোঁচকা তিনটে রাখল তার মধ্যে। গর্ত ভরাট করল ওরা চেপেচুপে, তার ওপর চাপড়াগুলো যত্নের সঙ্গে বসিয়ে দিল যার যার জায়গায়। পায়ের আলতো চাপে কিনারাগুলো মিলিয়ে দিল। খালের পানিতে খন্তাটা ধুয়ে নিল ফয়েজ, নইলে শুকিয়ে দাগ ফুটে উঠবে মাটির। কাজ সেরে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল ওরা।

'একটা কথা ভাবছি,' খানিক উসখুস করে বলল ফয়েজ।

'কি?' সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ এক টানে ধোঁয়ায় ফুসফুস ভরে নিল রানা।

'আমরাও আপনার সঙ্গে গেলে কেমন হয়? এখানে তো কাজ নেই আমাদের। অনর্থক...'

'ওখানেও কোন কাজ নেই তোমাদের। যে কাজে আমি যাচ্ছি, তাতে এতজনের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমরা জানো, ওরা এখন চারজনের একটা দল খুঁজছে, তিনজন পুরুষ আর এক মেয়ের একটা গ্রুপ, ঠিক?'

'জ্বি।'

'কেন তাহলে শুধু শুধু এক্সপোজড হওয়ার ঝুঁকি নিতে যাব? এমনিতেও কিছু দূর পর্যন্ত সেই ঝুঁকি মাথায় করেই তো যেতে হবে আমাদের।'

আর কিছু বলল না কেউ। পরদিন সকালে মিসেস হকের সঙ্গে একান্তে কথা বলল মাসুদ রানা, তারপর নয়টার সময় রওনা হয়ে গেল ওরা। শহরে গ্যাস স্টেশন থেকে তেল নিল রানা। যদিও দরকার ছিল না, আগের দিন বিকেলেই বুইকের ট্যাঙ্ক ভরে নিয়েছিল ও। তবু নিল যেটুকু আঁটে, যাতে তেল ভরার ফাঁকে স্টেশন অ্যাটেনডেন্ট ওদের জোর গলার আলোচনা শুনে বুঝতে পারে যে ওরা ম্যাকন চলে যাচ্ছে।

ওখান থেকে হব্সিতে এল। নাস্তা খেল পেট ঠেসে। রাজকীয় নাস্তা। অরেঞ্জ জুস, ভেড়ার মাংস, ডিম, প্যান কেক, গ্রিটস, কর্ন মাফিন, সুইট বাটার, জ্যাম এবং কফি। অর্ডার লিখতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল রোজের। 'পেটে দেখছি সবার রাক্ষস ঢুকেছে একটা করে।'

'তা বলতে পারো,' হেসে উঠল রানা। 'তাছাড়া হুইটারের শেষ খাওয়াটা স্মরণীয় করে রাখতে চাই আমরা।'

'মানে?' পেন্সিল কানে গুঁজে কপাল কোঁচকাল ওয়েট্রেস। রানার দিকে তাকাল। 'চলে যাচ্ছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ। ম্যাকন যাচ্ছি, খুব জরুরী।'

মুখ কালো হয়ে গেল মেয়েটির। রানা বুঝল, এতগুলো টাকা ফেরত দিতে হবে বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেছে। 'ভেবো না। টাকাটা ফেরত দিতে হবে না, রেখে দাও। ওটা তোমার।'

'কিন্তু, বিনা কাজে এতগুলো টাকা...'

'ভুলে যাও। খেতে দাও জলদি, পেট জ্বলছে।'

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে গিলল ওরা। তারপর তৃপ্তির ঢেকুর তুলে চুমুক দিল কফির কাপে। দশটার সামান্য আগে হব্সি ত্যাগ করল ওরা, গড়াতে শুরু করল বুইক রিভেরা। বিল্লাহ ড্রাইভ করছে, মাসুদ রানা বসেছে তার পাশে, হাতে ম্যাপ। অনেকটা পথ ঘুরে

হুইটারের ব্যাকরোডে উঠল গাড়ি, তারপর পঙ্খিরাজের মত ছুটল ইন্টারস্টেট হাইওয়ের উদ্দেশে।

একটার দিকে ফারগো অতিক্রম করল ওরা। পেটে কারও খিদের আলামত নেই দেখে থামতে বারণ করল মাসুদ রানা। টানা চালিয়ে সন্ধের আগে ফ্লোরিডার লেক সিটি পৌঁছল ওরা। পথে কেউই তেমন কথাবার্তা বলেনি নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া। নাদিরা সবচেয়ে বেশি চুপচাপ। গতরাতে রানার পরিকল্পনা শুনেই চুপ হয়ে গেছে মেয়েটি। রাতে ঘুম প্রায় হয়নি তার, জানে মাসুদ রানা। পাশের খাটে নাদিরার বারবার এপাশ ওপাশ করা টের পেয়েছে, কিন্তু এ নিয়ে কথা তোলেনি ও। ইচ্ছে হয়নি। ব্যস্ত ছিল ভবিষ্যৎ চিন্তায়। রানা জানে এ মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় আছে নাদিরা, কিন্তু সে শুধুই রানার আর নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত। আর মাসুদ রানার দুশ্চিন্তা আরও গভীর, আরও ব্যাপক। এক সঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। তাই মন চাইলেও কথা আসছে না মুখে।

লেক সিটিতে যাত্রাবিরতি করল মাসুদ রানা। মুখে রুচি নেই, তবু খেলো ওরা সবাই। খুঁজেপেতে একটা ইউজড কার লটে হাজির হলো। ছয় বছরের পুরানো একটা ডজ পছন্দ করল বিল্লাহ, দেখে শুনে কিনে ফেলা হলো ওটা। পুরানো হলেও লক্কড় মার্কা নয়, এঞ্জিনটা বুইক রিভেরার এঞ্জিনের চাইতে ভাল। সুটকেসগুলো চাপানো হলো ডজে। ওদের সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলল মাসুদ রানা। নাদিরার মনোভাব বুঝতে পেরে তার বাহুতে হাত বুলিয়ে দিল। 'ভেবো না। ঠিকই ফিরে আসব আমি।'

মনের জমাট বাষ্প আচমকা গলে পানি হয়ে গেল মেয়েটির, মোটা ধারায় গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল তার দু'গাল বেয়ে। মাসুদ রানা, মুত্তাকিম বিল্লাহ, ফয়েজ আহমেদ, ওদেরও মন

খারাপ, কিন্তু কারও চেহারায় তার প্রকাশ নেই। ওরা প্রফেশনাল, এসব মেয়েলী আবেগ ওদের প্রকাশ করতে নেই, মানায় না। কোন বিদায় সম্ভাষণ না, কিচ্ছু না, ঘুরে বুইকের দিকে হাঁটা ধরল মাসুদ রানা। ডজ ফিরে চলল হুইটার, বুইক ছুটল জ্যাকসনভিল।

পথে দু'বার গাড়ি থামাল মাসুদ রানা। এক ড্রাগ স্টোর থেকে হেয়ার ব্লিচ, ডাই ইত্যাদি কিনল। আরেক ডিপার্টমেন্ট স্টোর থেকে কিনল মেরুন প্যাকস, সাদা মোজা, চামড়ার স্ট্র্যাপওয়ালা স্যাণ্ডেল, হাফ হাতা প্রিন্টেড স্পোর্টস শার্ট, মিররড সানগ্লাস ও একটা সস্তা ক্যামেরা।

বেশ রাত হয়ে গেল ওর পৌঁছতে। এক থ্রী স্টার হোটেলের পার্কিং লটে বুইকটা বিসর্জন দিয়ে ট্যাক্সি চেপে মাইল দু'য়েক দূরের আরেক হোটেলে উঠল মাসুদ রানা। চুল এবং ভুরুর রং পাল্টাতে গিয়ে ঝাড়া ছয় ঘণ্টা ব্যয় হলো ওর। ঘুমাবার সময় খুব কমই জুটল। সকালে ফোলা ফোলা চেহারা নিয়ে চেক আউট করল শুকনো খড় রঙের চুল, ভুরুওয়ালা, ট্যুরিস্টবেশী মাসুদ রানা। এক কাঁধে শোল্ডার ব্যাগ, আরেক কাঁধে ক্যামেরা। বাসে চেপে অরল্যাণ্ডো পৌঁছল ও দুপুরের পর।

পকেটের অবস্থা খুব একটা সুবিধের নয়, তাই প্রচুর দর কষাকষি করে দশ বছর বয়সী একটা ওল্ডসমোবাইল কাটলাস কিনল রানা এখান থেকে। ওটা নিয়ে উঠে এল আবার সেই রুট নাইন্টি ফাইভে। একে একে কোকোয়া, পাম বে, ভেরো বীচ, পাম বীচের পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল মায়ামির দিকে। যতই শহরটা এগিয়ে আসছে, ততই ঘন হচ্ছে ট্রাফিক। প্রচণ্ড চাপ গাড়ি ঘোড়ার। সীজনাল ট্রাফিক। গতি কমতে কমতে শামুক গতিতে এসে ঠেকল। সামনে তাকালে মনে হয় স্থবির হয়ে গেছে ট্রাফিক, নড়ছে না।

শহরে ঢুকতেই লাগল দুই ঘণ্টা। অভিবাসী কিউবানদের সেকশনে চলে এল মাসুদ রানা। খুদে আরেক হাভানা যেন এলাকাটা। এদেশীরা তেমন একটা পাত্তা পায় না এখানে। এদের সঙ্গে আছে সাউথ আমেরিকান বিভিন্ন দেশের নাগরিক, এক জোট হয়ে হেন কুকাজ নেই যা করে না এরা। জুয়া, জালিয়াতি, বেশ্যাবৃত্তি, খুন-গুমখুন, ড্রাগ, সব খোলামেলাভাবে চলে এখানে। বিরাট এক সশস্ত্র গ্যাং পোষে এখানকার দু'নম্বরি কিউবান ব্যবসায়ীরা। এতই শক্তিশালী এ গ্যাং যে স্থানীয় মাফিয়াও তার কাছে পাত্তা পায় না।

একটা পার্কিং লেখা সাইনের নিচে কাটলাস দাঁড় করাল মাসুদ রানা। দরজা লক করে ফুটপাথে উঠে পড়ল। ভিড় ঠেলে মিনিট পাঁচেক হাঁটল রানা, এরাস্তা ওরাস্তা ঘুরে একটা গলিতে এসে ঢুকল। বাঁ দিকের চারটে বাড়ি ছেড়ে পঞ্চমটার দরজায় মৃদু টোকা দিল। ঘিঞ্জি এলাকা, অনেকটা ঢাকার বনগ্রাম রোডের মত। বাড়িগুলো সব গায়ে গায়ে লাগানো।

দেরি দেখে আবার নক করতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, এই সময় দরজার ওপাশে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। খুলে গেল দরজা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট তাগড়া এক কিউবান। সাদামাঠা চেহারা, গায়ের রং প্রায় কালো। জিজ্ঞাসু চোখে মাসুদ রানার দিকে চেয়ে থাকল সে। চেহারা দেখে মনে হয় যেন ওকে চেনার চেষ্টা করছে কিউবান।

ডান তর্জনী পিস্তলের মত তার বুকে ঠেকাল মাসুদ রানা, চাপ দিয়ে দু'পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল তাকে। 'ভেতরে ঢুকতে দাও, আরমান্দো।'

এইবার চিনল ওকে কিউবান। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে। 'মা…মা…!'

‘শাটাপ!’ চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ও। ‘ভেতরে চলো।’

‘আঁ-হ্যাঁ, আসুন আসুন!’ দ্রুত পিছিয়ে গেল আরমান্দো। কেমন এক দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, আরেকবার আপাদমস্তক দেখল ওর। ‘আসুন, ভেতরে চলুন।’

দশ বাই দশ একটা রুমে ঢোকাল রানাকে আরমান্দো। বসার ঘর। এক সেট আধ ময়লা কভারের সোফা, একটা সেন্টার টেবিল, দুটো কাঠের চেয়ার আর একটা রাইটিং টেবিল, এই হলো রুমটার আসবাব। দ্বিতীয় টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে আছে নানান হাবিজাবি। ওর মধ্যে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসও আছে। আর আছে একটা টেলিফোন।

‘বসুন।’

একটা চেয়ারে বসল মাসুদ রানা। ভাল করে তাকাল কিউবানের দিকে। লোকটার পুরো নাম আরমান্দো সোকারাস। পেশা দালালি। যে কোন জিনিস কেনাবেচায় সমান পারঙ্গম আরমান্দো। সবার হাঁড়ির খবর রাখে। অতীতে অনেকবার অর্থের বিনিময়ে কাজ আদায় করেছে রানা এর কাছ থেকে।

‘আমাকে দেখে চমকে উঠলে মনে হলো? নাকি ভুল দেখেছি?’ স্থির দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখছে মাসুদ রানা।

ধপ করে সোফায় বসল আরমান্দো সোকারাস। মাথা নাড়ল জোরে জোরে। ‘ভুল দেখেননি, বস্,’ ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল সে। ‘ভুল দেখেননি। ঠিকই দেখেছেন।’

‘চমকাবার কারণ?’

‘মাই গড, বস্! আপনি...না জানার ভান করছেন?’

কড়া চোখে লোকটাকে শাসাল রানা। ‘ফালতু এবং বাড়তি কথা, কাজের সময় এর কোনটাই আমি পছন্দ করি না, তুমি

জানো। যা বলতে চাও সরাসরি বলো, আরমান্দো।'

খানিক আমতা আমতা করল কিউবান, মনে হলো কথা গুছিয়ে উঠতে পারছে না। 'ও-ওরা এসেছিল, বস্!'

'বলে যাও।'

'রবার্টো গার্সিয়া। আজই এসেছিল। আপনার ব্যাপারটা বাজারে জানাজানি হয়ে গেছে, বস্। আমার মনে হয় এখনও যায়নি ওরা, মায়ামিতেই আছে।' একটু বিরতি দিল আরমান্দো, মোনাজাতের মত ঘন ঘন মুখ ডলল দু'হাতের তালু দিয়ে। 'হুমকি দিয়ে গেছে রবার্টো। বলে গেছে, যে মাসুদ রানাকে সাহায্য করার দুঃসাহস দেখাবে, সে যেন আগেই কথা বলে রাখে নিজের আণ্ডারটেকারের সঙ্গে। আজ সারাদিন আপনিই ছিলেন বাজারের আলোচনার বিষয়বস্তু, বস্। একমাত্র বিষয়বস্তু।' ঢোঁক গিলল কিউবান।

একটু চিন্তা করল মাসুদ রানা। 'তুমি কি ভয় পেয়েছ?'

ঝট করে মুখ তুলল আরমান্দো। 'নিজের কথা ভেবে? রবার্টোকে? না, বস্। ওকে আমি ভয় পেতে যাব কেন? ওসব মাফিয়া-টাফিয়া কেয়ার করি না আমরা। আমি আপনার জন্যে ভয় পাচ্ছি। সবাইকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে গেছে রবার্টো, "মাসুদ রানা গোজ নোহোয়্যার"।'

'মাসুদ রানা গোজ এভরিহোয়্যার,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। মুখে কঠিন হাসি। 'তুমি সেটা ভাল করেই জানো।'

থমকে গেল কিউবান। অপলক চোখে দেখল ওকে। মুখে হাসি হাসি ভাব, কিন্তু সেটার বিস্তার ঘটাতে সাহস পাচ্ছে না। 'হ্যাঁ, বস্। জানি।'

'গুড। এবার আমার দুটো প্রশ্নের সোজা উত্তর দাও। স্রেফ হ্যাঁ, অথবা না। একজনের নামে নতুন কাগজপত্র তৈরি করতে

হবে। পাসপোর্ট, ভিসা, আইডি, সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি। সম্ভব?'

'নাদিরার নামে?'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। দুই ভুরুর মাঝখানে সামান্য কুঞ্চন দেখা দিল ওর।

'সরি, বস্। অভ্যাসের দোষ। উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ।'

'এবং একটা প্লেন চার্টার করে দিতে হবে। সম্ভব?'

খানিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলল আরমান্দো। 'হ্যাঁ। আশা করি।' মাসুদ রানা বিরক্ত হতে পারে ভেবে দ্রুত যোগ করল তার সঙ্গে, 'এর কোনটাই আমি নিজে পরিচালনা করি না, বস্। ইউ নো। দুটোর ব্যাপারেই বিশ্বস্ত আউটফিটের সঙ্গে আগে আলোচনা করতে হবে আমাকে। তবে এটুকু নিশ্চিত থাকুন, আরমান্দো জানে তার দৌড় কতদূর। সেই ভরসাতেই "হ্যাঁ" বলে দিয়েছি আমি অলরেডি।'

'অল রাইট। খোঁজ নাও তাহলে। কথা বলো।'

'কাল সকালেই...'

'কাল নয়। আজই।'

'আজই?'

'আমার তাড়া আছে, আরমান্দো।'

একটু চিন্তা করল কিউবান। 'ওকে, বস্। আপনি যা বলেন। আলোচনার ফলাফল কোথায় জানাতে হবে? কোথায় পাব আপনাকে?'

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। 'ঠিক দু'ঘণ্টা পর তোমাকে টেলিফোন করব আমি।'

'ঠিক আছে,' আসন ছাড়ল আরমান্দো। 'এখনই তাহলে বেরুতে হয়।'

মাসুদ রানাও উঠল। আলতো করে একটা হাত রাখল কিউবানের কাঁধে। প্রায় চমকে উঠল লোকটা। 'কি!'

'আমার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো তুমি, কেবল একটা বিষয় ছাড়া,' গম্ভীর, থমথমে গলায় বলল রানা। চাউনি শীতল।

রক্ত হিম হয়ে গেল আরমান্দোর। আতঙ্কে ঘাড়ের খাটো চুল দাঁড়িয়ে গেল তার। 'কি, বস্?'

'আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাঁচতে পারেনি কেউ কোনদিন। বিশ্বাসঘাতকদের নিজ হাতে যমের বাড়ি না পাঠানো পর্যন্ত বিশ্রাম নেই না আমি।'

'এ-এসব কি বলছেন, বস্?' ঘাম ছুটে গেল কিউবানের। 'আমি আপনার সঙ্গে…!'

'আমি কেবল যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে, তাদের পরিণতির কথা তোমাকে জানালাম। ফর ইওর ইনফর্মেশন। আর একটা কথা মনে রেখো, রবার্টোর সঙ্গে তোমার ব্যবসা হলে একবারই হবে, এবং সেটাই হবে তোমার শেষ ব্যবসা। আর আমার সঙ্গে হবে আজীবন। যদি লোভ সামলে বিশ্বস্ত থাকতে পারো তুমি। চলি। সময় হলে টেলিফোন করব। আর হ্যাঁ, কাজটা কার জন্যে করছ তা যেন কেউ না জানে।'

বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। মাথায় রবার্টোর চিন্তা। সত্যিই আছে সে এখানে? নাকি বাজারে হুমকি ছড়িয়ে দিয়ে ওদের খোঁজে ফিরে গেছে? কেমন ভ্যাপসা গরম লাগছে। আকাশের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মেঘ করেছে খুব। বাতাস আছে, তবে আর্দ্র। ঝড় উঠবে নাকি? একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে খেয়ে নিল রানা। দুপুরের খাওয়া মিস গেছে আজ, মোটামুটি পুষিয়ে নিল সেটা। ওখান থেকে বেরিয়ে ছুটল জুয়েলারি মার্কেট।

এক ঘণ্টায় তিনটে দোকান ঘুরল রানা, পাথরের বোঝা অর্ধেকের মত কমিয়ে ফেলল পঁচাশি হাজারে। নগদ টাকার ভ্রাম্যমাণ গুদামে পরিণত হলো ওর শোল্ডার ব্যাগ। তবে ব্যাটারা বড্ডো হারামী। তিন ভাগের দু'ভাগ দামও দেয়নি। ব্যাপারটা টের পেয়েও বিশেষ ঝোলাঝুলি করেনি মাসুদ রানা। কারণ এই মুহূর্তে ক্যাশ প্রয়োজন, পকেট প্রায় খালি। আরমান্দো যদি কাজ দুটো করে দেয়ার উপযুক্ত আউটফিটের সন্ধান পেয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অগ্রিম দিতে হবে তাকে। কাজ দুটোর জন্যে কত হেঁকে বসে ব্যাটারা কে জানে!

যা-ই দাবি করুক, ভাবল মাসুদ রানা, ওর তাতে কিছু আসবে যাবে না। মাছের তেলে মাছ ভাজবে ও। টাকার এই ঘাটতি পরে অবশ্য আবার পূরণ করতে হবে রানাকে, কারণ ও স্থির করেই রেখেছে, এসব বিক্রির পুরো টাকাই বনোমোর নিহত হেলপারের পরিবারকে দেবে। ঠিক সময়মত আরমান্দো সোকারাসের নাম্বারে টেলিফোন করল রানা। ফোনের কাছেই বসা ছিল লোকটা, রিসিভার তুলল প্রথম রিং পুরো হওয়ার আগেই।

'ইয়েস!'

'আরমান্দো?' মাসুদ রানার কর্তৃত্বপূর্ণ ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়ে দিল কিউবানটিকে। একটা ঢোঁক গিলল সে নিঃশব্দে।

'জ্বি, বস্।'

'বলো।'

'সম্ভব, বস্।'

'দুটোই?'

'জ্বি, দুটোই। ও, একটা কথা, বস্।'

'আমি শুনছি।'

'পাসপোর্টে কোন দেশী ভিসা স্ট্যাম্প করতে হবে?'

'অস্ট্রেলিয়া।'

'এই যা! আমি তো ধরে নিয়েছিলাম…ইউ নো, বস্, এখান থেকে অল দ্যা রোড গোজ টু হাভানা!'

'এদিক-ওদিক, যেদিকেই হোক, কিছু আসে-যায়?'

'না, বস্। পয়সা কিছু বেশি লাগবে, এই যা।'

'কত?'

আবার ঢোঁক গিলল আরমান্দো। 'অনেক দাবি করছে ওরা, বস্।'

প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল মাসুদ রানা। 'কত?'

'হাফ আ মিল।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। ভাবছে। বুঝে ফেলেছে, এই টাকায় যদি রাজি হয় ও, অর্ধেকের বেশিই আরমান্দোর পকেটে যাবে। 'ওর অর্ধেক।'

'কি বললেন, বস্?'

'ওদের বলো, দু'লাখ পর্যন্ত দিতে রাজি আমি। তার বেশি এক পয়সাও নয়। আর কমিশন বাবদ তুমি পঞ্চাশ পাবে। ফিফটি থাউজেণ্ড। দ্যাট'স অল।'

'কিন্তু…'

'কথা বলো ওদের সঙ্গে। তুমি নিশ্চই ওদেরকে আমার কথা বলোনি?'

আঁতকে উঠল কিউবান। 'হোলি গড, নো!'

'তাহলে ওদের এত চার্জ করার কোন কারণ আমি দেখি না। স্বাভাবিক রেটের চাইতে বহুগুণ বেশি দাবি করছে ওরা।'

'সে আমিও খুব ভালই জানি, বস্। কিন্তু জেনেও কিছু করতে পারছি না। এ নিয়ে যত বেশি কথা বাড়াব, ততই কথা ছড়ানোর আশঙ্কা আছে। তাছাড়া, আমি নাম না বললেও ওরা হয়তো

অনুমানে আপনাকেই মক্কেল ধরে নিয়েছে, যে জন্যে এত দাবি করে বসেছে। অ্যাজ দা সে গোজ, আপনার কাছে আছে। তাই। আজই ও এলো, আর আমিও মাঠে নামলাম, সন্দেহ তো করতেই পারে, বস্!'

আবার খানিক চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। যুক্তি আছে আরমান্দোর কথায়। ব্যাপারটা ভেবে দেখার বিষয়। 'ঠিক আছে। ওদের জন্যে আড়াই, তোমার জন্যে পঞ্চাশ। দ্যাট'স ফাইনাল। আবার আলাপ করো। এখনই। এক ঘণ্টা পর আবার যোগাযোগ করব আমি।'

'জানি না আলোচনার ফল কি হবে, তবে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব, বস্। যদি সফল হই, অগ্রিম প্রয়োজন হবে।'

'পাবে। রাখলাম।'

'বস্?'

'বলো।'

'সতর্ক থাকবেন। বি ভেরি কেয়ারফুল, বস্।'

'মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। রাখি।'

রিসিভার রেখে পাব থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। সাড়ে বারোটা বাজে। কমে এসেছে মানুষের ব্যস্ততা। কাটলাস ছোটাল রানা, মিশে গেল গাড়ির মিছিলে। আপাতত কোন কাজ নেই, অতএব কোথাও বসে সময়টা কাটাতে হবে। কোথায় যাওয়া যায়?

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। গাড়ি ঘুরিয়ে কিউবান সেকশনে চলে এল মাসুদ রানা। আগের সেই সাইনটার নিচে পার্ক করল কাটলাসটা। লক করল বেরিয়ে এসে। তারপর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল আরমান্দো সোকারাসের আস্তানার দিকে। কাঁধে ঝুলছে

টাকার থলে। স্পোর্টস শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খোলা। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে শোল্ডার হোলস্টার।

আরমান্দোর বাড়ির উল্টোদিকের এক বাড়ির বন্ধ ফটকের সামনে অন্ধকারে দাঁড়াল মাসুদ রানা। অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এলাকা, মানুষজনের আনাগোনা তেমন চোখে পড়ছে না। হাত দিয়ে চেপে দরজাটা বন্ধ আছে কিনা দেখে নিল রানা। আছে। ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তাকিয়ে থাকল আরমান্দোর বন্ধ দরজার দিকে। কোন আলো জ্বলছে না বাড়িটায়। অন্ধকার। অনড় দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। ঘড়ির কাঁটা খুব ধীর গতিতে ঘুরছে। কয়েকবার পা বদল করল ও। চাপ পড়ছে নার্ভের ওপর।

পায়ের আওয়াজ পেল ও। গলা সামান্য বাড়িয়ে উঁকি দিল গলির মাথায়। দুটো ছায়ার ওপর চোখ পড়ল, এদিকেই আসছে। একটা ছায়া খাটো, অন্যটা লম্বা। ঢ্যাঙা। আরেকটু এগোতে খাটো ছায়াটাকে চিনল মাসুদ রানা, আরমান্দো। ওর সঙ্গে ওটা কে? আস্তানার দরজায় এসে থেমে দাঁড়াল কিউবান, দরজা খুলে ঢ্যাঙাকে ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলল। ঢুকে পড়ল লোকটা। পা বাড়াল মাসুদ রানা। ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আরমান্দো, চমকে উঠল ওকে দেখে। 'জেসাস ক্রাইস্ট! আপনি?'

'ঢোকো ভেতরে।' দরজাটা রানা নিজেই বন্ধ করল। 'চলো, ভেতরে বসা যাক।'

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে কিউবান। 'নিশ্চই, আসুন। আপনি আসায় ভালই হলো, বস্।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। কাগজপত্র কার নামে, কোন ঠিকানায় হবে, টেলিফোনে

জেনে ওকে জানাব ভেবেছিলাম। সে জন্যেই নিয়ে এসেছি ওকে। ওসব তৈরিতে ওস্তাদ মানুষ।' ঢ্যাঙাকে দেখাল আরমান্দো চোখের ইশারায়।

'তার মানে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তোমার পার্টি?'

'করেছে। অনেক চাপাচাপির পর। জান খারাপ করে দিয়েছে ব্যাটারা আমার। মুখ দিয়ে ফেনা বের করে ছেড়েছে।'

'যাক, সফল হয়েছ শুনে খুশি হলাম।' ঘুরে ঢ্যাঙার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। ছয় ফুট চারের কম হবে না মানুষটা। বয়স ষাটের মত সম্ভবত। চকচকে কাপড়ের কালো রঙের সুট, কালো জুতো, কালো মোজায় আণ্ডারটেকারের মত লাগছে লোকটাকে। গায়ে আধ ময়লা সাদা শার্ট। গলায় জুতোর ফিতের মত সরু কালো টাই। মুখটা লম্বা, কফিন আকারের। গালে, কপালে ছোট ছোট বীচি আর স্মল পক্সের শুকনো দাগ।

রানার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছে লোকটা। অস্থির দৃষ্টিতে ঘরের মেঝেতে কি যেন খুঁজছে সে, অন্তত চোখ দেখে তাই মনে হয়। মুহূর্তের জন্যেও স্থির থাকছে না নজর, মুহূর্তে মুহূর্তে ডানে-বাঁয়ে, ওপরে-নিচে করছে। অনেকের চোখের মণি কাঁপা রোগ আছে, রানা ভেবেছিল এর-ও আছে বুঝি সে রোগ। কিন্তু একটু পরই ভুলটা ভাঙল। আসলে ভয়ে কাঁপছে মানুষটা, আতঙ্কিত হয়ে আছে। নীল শিরা জেগে থাকা দু'হাতে বাদামী রঙের একটা বড় খাম ধরে বসে আছে সে, কাঁপছে সেটা। এতই জোরে যে অনবরত খসর খসর আওয়াজ উঠছে।

মাসুদ রানার সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিল না আরমান্দো সোকারাস। রানাও আগ্রহ দেখাল না।

'তাহলে?' কিউবানের দিকে তাকাল ও।

'অর্ধেক টাকা অগ্রিম চায় ওরা।'

‘সম্ভব না। অত টাকা নেই এখন আমার কাছে।’ ব্যাগ থেকে আগেই আলাদা করে রাখা পঁচাত্তর হাজার বের করল মাসুদ রানা। ‘পঁচাত্তর আছে এখানে। রাখো এটা। বাকিটা পাসপোর্ট, চার্টারের ডকুমেন্টস ইত্যাদি নেয়ার সময় দেব।’

‘কিন্তু, বস্...’

‘তুমি জানো আমি ফালতু কথা বলি না, ফালতু ওয়াদা করি না। সময়মত পুরো টাকাই পাবে তুমি, আরমান্দো। নিশ্চিত থাকো।’

কিছু সময় চুপ করে বসে থাকল আরমান্দো। হাতে ধরা টাকাগুলো দেখছে। ‘ওকে, বস্। হোয়াটএভার ইউ সে।’

খুব সম্ভব টাকা দেখেই মণি কাঁপা রোগ সেরে গেছে ঢ্যাঙার। হাতের কাঁপুনিও কমে গেছে। ‘পেপার্স যার নামে হবে, তার ছবি লাগবে। আর নাম-ঠিকানা... আর কখন ওসব ডেলিভারি দিতে হবে... ।’

‘ছবি কয় কপি?’ প্রশ্ন করল রানা।

হিসেব করল লোকটা। ‘আঠারো কপি।’

‘কাগজপত্র তৈরি করুন। যখন ডেলিভারি নেব, ছবি নিয়ে আসব সঙ্গে। তখন সাঁটিয়ে দেবেন শুধু। আর সব সেরে ফেলুন।’

‘ঠিক আছে।’ খামের ভেতর থেকে কাগজ-কলম বের করল আণ্ডারটেকার। ‘কি নামে হবে কাগজপত্র?’

আধ ঘণ্টা পর বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। গাড়ি নিয়ে তুফান বেগে ছুটল চল্লিশ মিনিট দূরত্বের পমপানো বীচের দিকে। ওখানকার এক মোটেলে রাত কাটিয়ে সকাল ন'টায় ফিরে এল মায়ামি। ঘণ্টা দুয়েক চষে বেড়াল জুয়েলারি মার্কেট। প্রায় লাখ দেড়েক ডলার রোজগার করে রওনা হয়ে গেল রানা হুইটারের

দিকে।

নয়

চলতে চলতে ভাবছে মাসুদ রানা। আরমান্দো সোকারাসের একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। প্রশ্নটা ছিল, কাগজপত্র কোথায় বসে ডেলিভারি নিতে চায় ও। রানা বলে এসেছে, উপযুক্ত জায়গা ঠিক করে পরে তাকে ফোনে জানাবে। এবং কাগজপত্র নিয়ে একা আরমান্দো যাবে সেখানে। সঙ্গে আর কেউ যাবে না।

প্রথমটা মেনে নিলেও শেষ পয়েন্টে আপত্তি জানিয়েছে কিউবান। বলেছে, আর কেউ না হোক, অন্তত ঢ্যাঙাকে থাকতেই হবে তার সঙ্গে। পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ছবি সে-ই সেট করবে, প্রয়োজনে ছবির কিনারা ছাঁটতে হবে, ছবি বসিয়ে তাতে সীল মারতে হবে ইত্যাদি অনেক কাজ। ঢ্যাঙার (পরে জেনেছে রানা তার নাম ম্যানুয়েল গার্সিয়া) কাজ ওসব, আরমান্দোর নয়, অতএব তাকে থাকতেই হবে। আর যদি বস্ এখনই ছবিগুলো দিয়ে দেন, তাহলে আরমান্দো একাই যাবে সেখানে।

অকাট্য যুক্তি, এরপর আর কোন কথা চলে না। অতএব মেনে নিয়েছে মাসুদ রানা। যেখানে ওকে কাগজপত্র হস্তান্তর করবে, সেখানে থাকবে ম্যানুয়েল গার্সিয়া। তা-ও সই, তবু আগেভাগে নাদিরার ছবি হাতছাড়া করতে রাজি নয় রানা। তাতে বিপদে পড়ার মারাত্মক ঝুঁকি আছে। একদিক থেকে নয়, অনেক দিক থেকে।

গরম ক্রমেই বাড়ছে। রাতে বৃষ্টি হবে মনে হয়েছিল আকাশের অবস্থা দেখে, কিন্তু হয়নি। সারা আকাশ জুড়ে ব্যস্ত-

সমস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে ঘন কালো মেঘ, যেন মহাজরুরী কোন কাজ পড়ে আছে কোথাও, এখনই সেখানে না পৌঁছলেই নয়। মাঝেমধ্যে দূর থেকে মেঘ ডাকার গুড় গুড় আওয়াজ আসছে। যে-কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে ঝড়-বৃষ্টি। লক্ষণ সেরকমই। জানালার কাঁচ তুলে দিল মাসুদ রানা। শীত শীত লাগছে।

আরমান্দোর কথা ভাবতে বসল ও। লোকটা কি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? রবার্টোকে জানিয়ে দিতে পারে? পারে। লোভ যখন গ্রাস করে মানুষকে, স্বাভাবিক যুক্তি-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে সে। তখন এমন অনেক কিছু করে বসতে পারে মানুষ, সুস্থ স্বাভাবিক মাথায় যা ভাবাও যায় না। বেশি টাকার লোভে পড়ে রাবার্টোকে আরমান্দো সব কথা জানিয়ে দিতেও পারে।

তবে বেশ কয়েক বছর থেকে লোকটাকে চেনে মাসুদ রানা। অতীতে অনেকবার ওর কাজ করে দিয়েছে আরমান্দো, অনেক কাজ, কখনও তেড়িবেড়ি কিছু করেনি। এমন কোন রেকর্ডও নেই তার যে অমুকের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। ওটাই যা ভরসা।

তাছাড়া··· থেমে পড়েছে মাসুদ রানা। শুধু শুধু মাথা গরম করে লাভ আছে কিছু? ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ-ই। বর্তমান নয়। এক মিনিট পরের ভবিষ্যৎও ভবিষ্যৎ, আবার এক যুগ পরের ভবিষ্যৎও ভবিষ্যৎ। দুটোই অজানা। কে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে আগামী এক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হবে না মাসুদ রানার? এই যে উল্টোদিক থেকে ঝড়ের বেগে একের পর এক বাস-লরি, কার-ট্যাক্সি আসছে, এর যে কোন একটা ছুটে এসে যদি আছড়ে পড়ে ওর গাড়ির ওপর?

কি হবে ফলাফল? মুহূর্তে মৃত্যু। তেমন কিছু এড়াতে হলে

সতর্ক থাকা চাই, চোখ-কান খোলা রেখে চলা চাই। ব্যস্। মানুষের দৌড় ওই পর্যন্তই। সতর্ক থাকার পরও যদি বিপদ এড়ানো না যায়, করার আছেটা কি? উল্টোপাল্টা ভাবনার জন্যে নিজেকে কষে কয়েকটা চড় লাগাল রানা কল্পনায়, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে গাড়ি চালনায় মন দিল। সময়মত সতর্ক থাকবে ও, চোখ-কান খোলা রাখবে।

বৃষ্টি নামল। বাতাসের তাড়নায় খানিক ডানে কাত হয়ে, খানিক বাঁয়ে কাত হয়ে ঝরল। আস্তে আস্তে কমে এল বাতাস, কিন্তু বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেল। চেপে আসছে ক্রমেই। গাড়ির ছাদে বড় ফোঁটার বৃষ্টি ড্রাম বিটের মত শব্দ তুলছে। সামনের কাঁচ বেয়ে স্রোতের মত গড়িয়ে নামছে পানি। বন্যা দেখতে দেখতেই বুদ্ধিটা এল মাথায়। আরমান্দোর কাছ থেকে কাগজপত্র নেয়ার মত উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেছে মাসুদ রানা। কাটলাসের গতি আরও বাড়াল ও, জায়গাটা একবার দেখে যাবে হুইটার যাওয়ার আগে। পথেই পড়বে।

জ্যাকসনভিল শহরের মাইল তিনেক আগে ডানে বাঁক নিল মাসুদ রানা। মিনিট দশেক সোজা এগিয়ে কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে বাঁক নিল, পড়ল এসে মোটামুটি দুটো গাড়ি চলে এমন এক রাস্তায়। দু'দিকটা ফাঁকা, কোন বাড়ি-ঘর বা আর কিছু নেই। রাস্তাটাও বেশ পুরানো, কার্পেটিং নষ্ট হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন যত্ন নেয়া হয় না। বেশ কয়েক বছর আগে এসেছিল রানা এদিকে, বিশেষ এক কাজে।

সে সময়ে উপকূলে একটা ভাঙাচোরা, পরিত্যক্ত হোটেল দেখেছিল, এখনও আছে কি না ওটা, দেখে যেতে চায়। থাকলে এখানেই আরমান্দোর সঙ্গে অ্যাপয়েনমেন্ট করবে মাসুদ রানা। বিরান রাস্তাটা ধরে পাঁচ মিনিট একটানা চালিয়ে গতি কমাল ও,

এসে পড়েছে। আটলান্টিকের গর্জন শোনা যাচ্ছে সামনে। গতি আরও কমাল মাসুদ রানা, ডানের খোলা একটা গেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিল কাটলাসের নাক, তারপর একশো গজ এগিয়ে ব্রেক কষল।

বিরান এক কাঁটাতারের বেড়া দেয়া প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। ডান দিকে তিনটে বিল্ডিঙের কঙ্কাল, দু'দিকের দুটো সামান্য ছোট, মাঝখানেরটা বিশাল। বাঁ দিকে জংলা গাছ-পালা, ঝোপঝাড়ের আড়ালে আটলান্টিক মহাসাগর। সাদা ফেনার মুকুট পরা বিশাল একেকটা ঢেউ আছড়ে পড়ছে এসে তটে। গোল্ডেন বীচ জায়গাটার নাম। স্থানের নামে নাম রাখা হয়েছিল হোটেলটার, গোল্ডেন ভিউ।

চার একর জায়গা নিয়ে ১৯২০ সালে তৈরি হয় এটা। আমেরিকার নাম করা প্রথম শ্রেণীর হোটেলগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। সে সব আজ ইতিহাস। মাঝখানের কাঠামোটা ছিল মূল হোটেল। ওটার সামনের ছাদ ধসে পড়া বিশাল পিলারড পোর্টিকো দেখলে মনে হয় চীনা রূপকথার দৈত্যাকার কোন ড্রাগন। বাঁ দিকের ছোট কাঠামোটায় আগুন লেগেছিল অতীতে কোন এক সময়, পোড়া কাঠ, পোড়া দেয়াল এখনও তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গোল্ডেন ভিউর সামনে সবুজ লন ছিল এক সময়, ছিল মনোরম বাগান, ফুলের ঝাড়-বেড, সারি সারি পাম গাছ—এখন কিছু নেই। কাদা মাটি, আর এখানে ওখানে গর্তে জমে থাকা পানি ছাড়া। মেইন বিল্ডিঙের ছাদের একাংশ খসে পড়েছে। জানালার ফ্রেম নেই একটাও। দরজার অবস্থাও প্রায় এক। এক-আধটা পাল্লা আছে, জং ধরা কবজার সঙ্গে ঝুলছে, সশব্দে এদিক-ওদিক দুলছে বাতাসে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মাসুদ রানা। শোল্ডার ব্যাগ দিয়ে মাথা আড়াল করে এগোল মূল ভবনটার দিকে। ১৯৩৮ সালে প্রচণ্ড এক হ্যারিকেনের আঘাতে বিধ্বস্ত হয় গোল্ডেন ভিউ। ফুলে ফেঁপে তার দোতলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল আটলান্টিক। দেয়ালে এখনও আছে লবণ পানির সেই দাগ। পোর্টিকোর চওড়া সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে ওপরে উঠে এল মাসুদ রানা।

দেয়ালের গায়ে রং চটা একটা নোটিস দেখা গেল। নোটিসটার বক্তব্য উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হলো মাসুদ রানাকে। ওতে বলা হয়েছেগু বেআইনী অনুপ্রবেশকারীকে আইনের হাতে সোপর্দ করা হবে। কিন্তু ওটা চোরদের নিরুৎসাহিত করতে পেরেছে বলে মনে হলো না ওর, কারণ গোল্ডেন ভিউর কড়ি-বরগা, দরজা-জানালা, কিছুই প্রায় রাখেনি তারা। সব ফরসা করে আলো বাতাসের মুক্ত চলাচলের পথ করে দিয়েছে।

প্রকাণ্ড ফলেই-এর মেঝেতে স্থানীয় ছেলে-ছোকরাদের পিকনিক, পট পার্টি ইত্যাদির প্রচুর আলামত চোখে পড়ল মাসুদ রানার। কোথাও কোথাও স্তূপ হয়ে আছে থক্থকে কাদার মত পচা আবর্জনা। আর আছে ছেঁড়া-ফাটা, পানিতে বরবাদ হওয়া অজস্র ম্যাট্রেস, খালি বীয়ারের কৌটো আর পাখির মল। মাথার ওপর পাখির আনাগোনা টের পেল মাসুদ রানা। উঁচু সিলিঙের ফাঁক-ফোকরে যেখানেই সুবিধে পেয়েছে, সেখানেই আবাস গেড়েছে ওরা। চারদিকের বাতাসে নোংরামি আর মৃত্যুর গন্ধ ভাসছে মনে হলো রানার।

সন্ধে হয়ে আসছে। বেরিয়ে এল রানা। যতটা সম্ভব কাদা-পানি এড়িয়ে উল্টোদিকের ঝোপঝাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল প্রশস্ত লন অতিক্রম করে। দুই আড়াইশো গজ দূরে দেখা যাচ্ছে

গোল্ডেন বীচ। বহু আগেই পরিত্যক্ত। উলঙ্গ একটা জেটি দাঁড়িয়ে আছে তীর থেকে খানিকটা দূরে। ওটায় পৌঁছার কাঠের প্যাসেজের তক্তাগুলো গায়েব। এখানে-ওখানে জেটির লোহার দেহ খসে গেছে। ঢেউয়ের তোড়ে ভীষণভাবে দুলছে ওটা। গোল্ডেন ভিউর সঙ্গে গোল্ডেন বীচও ঠাঁই পেয়েছে ইতিহাসে। আটলান্টিকের নোংরা আবর্জনা বোঝাই পানি ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে এসে ততোধিক নোংরা সোনালী সৈকতে।

আর দেরি করা যায় না। তাড়াতাড়ি গাড়িতে এসে উঠল মাসুদ রানা। শোল্ডার ব্যাগ থেকে ব্যবহৃত শার্ট-প্যান্ট বের করে পাল্টে ফেলল ভেজা পোশাক। তারপর নাক ঘুরিয়ে ছুটল গেটের দিকে। গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠে বাঁয়ে টার্ন নিল, অ্যাক্সিলারেটর দাবিয়ে গতি বাড়াল, ছুটে চলল ফিরতি পথে। এটা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই গোল্ডেন ভিউ যাওয়ার বা আসার। হেড লাইট জ্বেলে দিল মাসুদ রানা, আঁধার হয়ে গেছে। জ্যাকসনভিলে ডিনার খেলো ও, সেই সঙ্গে দুপুরের হরিমটরের ক্ষতিটাও পুষিয়ে নিল। আজও মিস করেছে রানা দুপুরের খাওয়া, অবশ্য ইচ্ছে করেই। সময় বাঁচানোর জন্যে থামেনি কোথাও।

শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটা পাব থেকে মিসেস পার্ল হকের নাম্বারে টেলিফোন করল মাসুদ রানা। ওর দেয়া ডেড লাইন কাছিয়ে আসছে, তার আগে হুইটারে পৌঁছাতে পারবে না রানা কিছুতেই। কাজেই ফোন করে ওদের জানিয়ে দেয়া দরকার যে এদিকে সব ঠিক আছে, ও ফিরে আসছে। তা না হলে মেয়েটিকে নিয়ে হুইটার ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে বিল্লাহ, ফয়েজ।

'তুমি কেমন আছ, সানি?'

বৃদ্ধার উল্লসিত কণ্ঠ শুনে আশ্বস্ত হলো মাসুদ রানা। হাসল নিঃশব্দে। 'ভাল।'

‘থাকতেই হবে। আজ সারা সকাল তোমার জন্যে গির্জায় বসে প্রার্থনা করেছি যে আমি।’

মুহূর্তে মনটা ভিজে উঠল ওর। ‘ধন্যবাদ, ম্যাম।’

‘সন্তানের জন্যে মা প্রার্থনা করবে, এতে ধন্যবাদ দেয়ার কি আছে? তুমি ধরো, আমি ওদের কাউকে ডেকে দিচ্ছি।’

ফয়েজ আহমেদের সঙ্গে এক মিনিট কথা বলল মাসুদ রানা, তারপর লাইন কেটে দিয়ে আরমান্দোর নাম্বার ঘোরাল। ‘কাগজপত্র তৈরি হতে ম্যানুয়েল গার্সিয়ার কতদিন লাগবে?’ ও প্রান্তে পরিচিত কণ্ঠের সাড়া পেয়ে প্রশ্ন করল ও।

‘তিন দিন সময় চেয়েছে ও, বস্।’

‘মানে আজ, কাল আর পরশু?’

‘হ্যাঁ।’

‘তার পরদিন হাতে পাচ্ছি আমি ওগুলো?’

‘নিশ্চই! কোথায় পৌঁছাতে হবে ওসব, বস্?’

‘পরশু সন্ধের পর জানাব তোমাকে কোথায় ওগুলো ডেলিভারি নেব আমি। অল রাইট?’

‘অল রাইট।’

লাইন কেটে দিয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। আড়াইটার দিকে হুইটার পৌঁছল ও। ওরা প্রত্যেকে, এমনকি মিসেস হক পর্যন্ত জেগে বসে ছিল রানার অপেক্ষায়। দু'চোখ মেলে রাখতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে তখন ওকে। নিচে কিছু সময় কাটিয়ে ওপরতলায় চলে এল রানা। নাদিরা এল পিছন পিছন। দরজা বন্ধ করল সে। তারপর রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটি। কাঁদছে ফুলে ফুলে। বাইরে প্রকৃতিও কাঁদছে অঝোর ধারায়।

বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ের মাতামাতি। বাতাস, বৃষ্টির এলোমেলো ছোটাছুটি আর ক্রুদ্ধ গর্জনে কান পাতা দায়। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ঘন ঘন বজ্রপাত। থেকে থেকে উজ্জ্বল নীলচে আলোয় ঝলসে উঠছে হুইটার, দুনিয়া কাঁপানো কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ছে। পুরো রাত পার হয়ে গেছে, এখনও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না অবস্থা পরিবর্তনের।

কাল বড়দিন। নিচতলার সিটিংরূমে ক্রিসমাস ট্রী সাজিয়েছে মিসেস পার্ল হক। এখানকার একমাত্র জেনারেল স্টোরের মালিক হকিন্স গাছটা পৌঁছে দিয়ে গেছে গতরাতে। প্রতি বছরই এই উপকারটুকু করে থাকে সে বৃদ্ধার। ওটা অলংকরণের কাজে বেশ ব্যস্ত এখন মহিলা। কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে তার মুখ। এমন আনন্দের দিনে ওরা থাকতে পারছে না জেনে মন খারাপ হয়ে গেছে, সেটাই বারে বারে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করছে মহিলা।

একই রূমের আরেক প্রান্তে বসে আছে মাসুদ রানা, মুত্তাকিম বিল্লাহ, ফয়েজ আহমেদ ও নাদিরা। জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত। মায়ামিতে আরমান্দোর সঙ্গে যোগাযোগ, তার ফলাফল এবং পরবর্তী প্ল্যান সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে রানা ওদের। সেই নিয়েই চলছে আলোচনা। সামনে একটা কাগজে ম্যাপ আঁকায় ব্যস্ত এখন রানা, হোটেল গোল্ডেন ভিউর এবং তার আশপাশের এলাকার ম্যাপ। কাজটা শেষ হতে ম্যাপটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও, কোথাও কোন ভুল আছে কি না বোঝার চেষ্টা করল। না, নেই।

সন্তুষ্ট মনে ওটার দুই জায়গায় দুটো খুদে বৃত্ত আঁকল রানা। একটা গোল্ডেন ভিউ যাওয়ার সরু পথের পাশের, হাঁটাপথে আনুমানিক এক মিনিটের দূরত্বে, একটা বড় ঝোপের পিছনে, অন্যটা হোটেলের ফয়েই-এর ঠিক পাশের রূমের দেয়াল ঘেঁষে।

‘এখানে তুমি থাকবে, আগে থেকে,’ পরের বৃত্তটায় ঠুক ঠুক করে পেন্সিল ঠুকল মাসুদ রানা। তাকিয়ে আছে ফয়েজ আহমেদের দিকে। ‘হোটেলের সামনে তোমাকে নামিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে বিল্লাহ। গাড়িটা আগেভাগেই আরমান্দো এবং জালিয়াত গার্সিয়ার চোখে পড়া চলবে না।’

‘ঠিক আছে,’ মাথা দোলাল গরিলা। ‘তারপর?’

‘তারপর শহরের মাথায় গিয়ে শেষবারের মত আরমান্দোকে ফোন করব আমি, জানাব কোথায় যেতে হবে তাকে কাগজপত্র নিয়ে।’

মাথা দোলাল সে। ‘জানালেন।’

‘ফোন করে বসে থাকব আমি নাদিরাকে নিয়ে। আমাদের থেকে খানিকটা এগিয়ে থেকে বিল্লাহও অপেক্ষা করবে গাড়ি নিয়ে, যতক্ষণ না ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় আরমান্দো। এরপর, ওরা এগিয়ে যাওয়ার পর নিরাপদ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করবে ওদের বিল্লাহ। ওরা হোটেল কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়বে, আর বিল্লাহ ওর গাড়ি এই ঝোপের কাছে পথের ওপর আড়াআড়ি করে রাখবে। যথেষ্ট লম্বা ডজটা, পুরো রাস্তা ব্লক হয়ে যাবে তাতে।

‘কেউ যদি আমাদের অনুসরণ করে, ওখানে এসে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আটকে যাবে। আড়ালে বসে তাদের আগমন সংবাদ আগেভাগে আমাদের জানিয়ে দিতে পারবে তুমি,’ দানবের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। ‘সে ক্ষেত্রে ছুটে চলে আসবে তুমি আমাদের সংকেতটা জানিয়েই। লক্ষ রাখতে হবে কয়টা গাড়ি বা কতজন মানুষ আছে দলে। সংখ্যায় ওরা অল্প হলে লড়ব আমরা। যদি তা না হয়, ছুটে সৈকতে গিয়ে বোটে উঠব।’ বোটের আইডিয়া আজই সকালে ঢুকেছে মাসুদ রানার মাথায়।

কি চিন্তা করে প্রশ্ন করল বিল্লাহ, ‘আপনি কি আশঙ্কা করছেন

তেমন কিছু ঘটবে, বেঈমানী করবে কিউবানটা?'

'না। আশঙ্কা করছি না। কিন্তু ঘটতে পারে। তাই আগে থেকে সতর্ক থাকা ভাল। বলা যায় না কিছুই।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমি রোড ব্লক করে দিলে আপনারা ঢুকছেন কিভাবে?'

'তুমি রওনা হয়ে যাওয়ার পর আমিও গাড়ি ছাড়ব। জোরে চালিয়ে তোমাকে, আরমান্দোকে ওভারটেক করব আমি গোল্ডেন ভিউর প্রাইভেট রাস্তায় প্রবেশ করার আগেই। আমরা জায়গাটা পার হওয়ার পর ব্লক বসছে তোমার, আগে নয়।'

'বুঝেছি। কিন্তু বোটের কি ব্যবস্থা?'

'জ্যাকসনভিলের যে কোন একটা বোট হাউস থেকে ভাড়া নিয়ে নেব।'

'কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত আরমান্দো না আসে?' প্রশ্ন করল নাদিরা।

'আসবে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'তাতে কোন সন্দেহ নেই।' নিচের ঠোঁট কামড়ে ভাবল ও। 'জ্যাকসনভিলে প্রথম কাজ হবে আমাদের আরও কিছু পাথর বিক্রি করা। এখনও সোয়া দুই বাকি রয়ে গেছে। আমার কাছে দেড়ের কিছু বেশি আছে, বাকিটা জোগাড় করতে হবে কালকের মধ্যে। তবে, সমস্যা একটা হতে পারে, যদি বড়দিন উপলক্ষে জুয়েলারি মার্কেট বন্ধ থাকে।'

'যদি থাকে?' বলল নাদিরা।

'কি আর করা! এখানে থেকে মিসেস হকের টার্কি রোস্ট আর কেক খাব। ফোন করে আরমান্দোকে দু'দিন অপেক্ষা করতে বলব।'

'কিন্তু, রানা, পাসপোর্ট-ভিসা হাতে পেলেও তো বিপদ কাটছে না আমাদের, তাই না? প্লেনে চড়তে হলে মায়ামি থেকেই

চড়তে হবে। শেষ মুহূর্তে যদি ঝামেলা বেধে যায় ওখানে?'

রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটল মাসুদ রানার ঠোঁটে। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না ও।

দুপুরে খেয়েদেয়ে এক ঘুমে সন্ধে করে দিল মাসুদ রানা। ঝড়ের বেগ অনেক কমে এসেছে এখন। বৃষ্টি প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু দমকা বাতাস। আর থেকে থেকে দূরাগত মেঘের গর্জন। সিটিংরূমে কিছু সময় গল্প-গুজব করে কাটাল সবাই, মিসেস হককে রান্না-বান্নার কাজে সাহায্য করল কিছুক্ষণ। যদিও বেশি সময় ওখানে টিকতে দিল না ওদের মুত্তাকিম বিল্লাহ। টার্কির রোস্ট তৈরির মশলার মধ্যে মনের সুখে গুঁড়ো গোল মরিচ মেশাতে গিয়ে কুকাজটা ঘটিয়ে বসল সে। মশলার লবণ ঠিক হয়েছে কি না চেখে দেখতে গিয়ে প্রথমে চোখ কপালে উঠল বৃদ্ধার। তারপর হাঁ হয়ে গেল মুখ।

প্রচণ্ড ঝালে দিশেহারা হয়ে মিনিট দু'য়েক কিচেনে প্রায় ছোটাছুটি করে বেড়াল মহিলা ওইভাবে। ঘামে ভিজে একাকার অবস্থা। রেগেমেগে বিল্লাহকে ঘাড় ধরে কিচেন থেকে বের করে দিতে গেল ফয়েজ, কিন্তু দেখা গেল ওর ঘাড় ঠিকমত হাতে পায় না সে। পায় ঠিকই, তবে বেশি খাটো হওয়ার দরুন ওই অবস্থায় তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারে না সে দানবের সঙ্গে, হাঁটতে গেলেই তার সঙ্গে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। শেষে বিরক্ত হয়ে মোষের মত গুঁতো মারতে মারতে বের করে নিয়ে গেল ফয়েজ বিল্লাহকে।

হাতে করে এটা-ওটা মুখে তুলে দিয়ে বৃদ্ধাকে শান্ত করল রানা বহু কষ্টে। কিন্তু তারপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে উল্টে ওকেই বের করে দিল মহিলা কিচেন থেকে। কেবল নাদিরা বেঁচে গেল মেয়ে বলে। বেশ রাত পর্যন্ত চলল তাদের রাঁধাবাড়া, আর বাইরে ছেলেদের আড্ডা। বড়দিনের সব রান্না সেরে রাখল বৃদ্ধা,

সকালে তাকে গির্জায় যেতে হবে। পরদিন রাত পোহাবার অনেক আগে, আরও কয়েকটা পাথর নিয়ে মাসুদ রানা একা চলে গেল জ্যাকসনভিল। একা গেল, কারণ ওর সন্দেহ ছিল আজ হয়তো মার্কেট খোলা পাওয়া যাবে না।

ওর আশঙ্কাই সত্য হলো। বড়দিন উপলক্ষে শহরের প্রায় সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। অতএব আরমান্দোকে আরও দু'দিন পর ও যোগাযোগ করবে বলে জানিয়ে দিল রানা। শহর ত্যাগ করার আগে অনেক খুঁজেপেতে মিসেস হকের জন্যে ওদের চারজনের তরফ থেকে চারটে গিফট কিনে নিতে ভোলেনি মাসুদ রানা। চমৎকার এক জোড়া চামড়ার জুতো, একটা দামী কুইল্টেড বেড জ্যাকেট, পারফিউম, একটা পাঁচ পাউন্ডের চকলেট বক্স ইত্যাদি কিনেছে সে।

আরও কিছু কেনাকাটা করল রানা। ও জানে, ওদের খাওয়ার পিছনে প্রচুর ব্যয় হচ্ছে মিসেস হকের। দুধ, কফি, প্যানকেক ফ্লাওয়ার, বীফ, বীয়ার, কোলা, টনিক ওয়াটার ও কয়েক বোতল ভদকা কিনল রানা। ওল্ডসমোবাইল কাটলাসের বুট বোঝাই করে গভীর রাতে হুইটার ফিরে এল ও। এক সঙ্গে এতকিছু উপহার পেয়ে আনন্দে অস্থির হয়ে কেঁদেই ফেলল মহিলা।

হুইটার অবস্থানের শেষ দুটো দিনের স্মৃতি ওদের সবার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাতাশ ডিসেম্বর।

আঁধার থাকতে উঠে যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে নিল ওরা। লোকজন জেগে ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়া ভাল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কেঁদে কেঁদে নাকমুখ ফুলিয়ে ফেলল মিসেস পার্ল হক। নাদিরার অবস্থাও এক। যতক্ষণ দেখা গেল, বার বার পিছনে

তাকাল সে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ির সীমানা প্রাচীরের গেটে এসে দাঁড়িয়ে থাকল বৃদ্ধা। হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। ওদের সঙ্গে কিছু দূর পর্যন্ত এল হাউণ্ডটা, তারপর ফিরে গেল। অন্ধকারে খুব দ্রুত হারিয়ে গেল হুইটার।

আগে আগে ছুটছে ওল্ডসমোবাইল কাটলাস, পিছনে ডজ। সামনেরটায় রয়েছে মাসুদ রানা ও নাদিরা। উইগ পরেনি আজ নাদিরা, বারণ করেছে মাসুদ রানা। তার বদলে একটা প্রিন্টের স্কার্ফ পেঁচিয়েছে মাথায়। পরেছে জিনস, উলেন স্পোর্টস গেঞ্জি, পায়ে কেডস। সবার ওপর মিঙ্ক কোট। মাসুদ রানা পরেছে সেদিনের কেনা মেরুন প্যাকস, স্পোর্টস শার্ট, তার ওপর কোট।

আগেরবারের মত ব্যাকরোড ধরে হোমারভিল চলল ওরা। একটু একটু করে ফরসা হয়ে উঠছে চারদিক, পাখিরা বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে নীড় ছেড়ে।

'মহিলা ক'দিন খুব কষ্ট পাবেন।' কাত হয়ে রানার দিকে সামান্য ঘুরে বসল নাদিরা। 'বেচারী!'

'হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ।'

'অত বড় বাড়িতে কি করে বছরের পর বছর একা আছেন মহিলা, ভেবে পাই না আমি।'

'এসবে অভ্যস্ত ওরা। খুব অসুবিধে হয় না, চলে যায় দিন।'

'আমিও অনেক বছর আছি এদেশে। কিন্তু এদের এই সমাজ ব্যবস্থা মন থেকে মেনে নিতে পারিনি আমি আজও। আমাদের দেশে এসব কল্পনাই করি না আমরা। তোমাদের সমাজ ব্যবস্থা কেমন, রানা?'

'ঐতিহ্যগতভাবে একান্নবর্তী। তবে এখন যুগের হাওয়া বদলেছে। এদের বাতাস আমাদের ওদিকেও যায়। মেয়েরা তো আছেই, কোন কোন পরিবারে বিয়ের পর ছেলেরাও আলাদা হয়ে

যায়। অবশ্য তাদের সংখ্যা এখনও কম।'

'তোমাদের পরিবার কি একান্নবর্তী?'

হাসল মাসুদ রানা। কি উত্তর দেবে ভাবছে।

'হাসছ কেন?'

'আমার কোন পরিবার নেই।'

'নেই মানে?' বিস্মিত হলো নাদিরা।

'নেই মানে? নেই মানে, কেউ নেই আমার।'

'বাবা-মা, ভাই-বোন, কেউ নেই?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'নাহ্। কেউ নেই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটি। একভাবে তাকিয়ে আছে রানার মুখের দিকে। 'বিয়ে করোনি?'

শব্দ করে হেসে উঠল এবার ও। 'আমার মত বাজে একটা ভবঘুরেকে মেয়ে দেবে কে?'

আর কিছু বলল না নাদিরা।

দশ

দুপুরের একটু আগে জ্যাকসনভিল পৌঁছল ওরা। দেখেশুনে সৈকতের কাছাকাছি এক মোটেলে উঠল। একটা টিলার ওপর, আটলান্টিকের জলোচ্ছ্বাসের সর্বোচ্চ মাত্রারও পঞ্চাশ ফুট ওপরে সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ধপধপে সাদা মোটেলটা। 'ইউ' শেপড। দোতলা। স্পেনীয় ধাঁচের টাইলের ছাদ। 'ইউ'-এর দুই বাহুর মাঝখানে চমৎকার ঘাসমোড়া লাউঞ্জিং এরিয়া। তার ঠিক মধ্যিখানে ছোট একটা সুইমিং পুল। ওঠার আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছে মাসুদ রানা, নিজস্ব কার রেন্টাল সার্ভিস তো

বটেই, বোট রেন্টাল সার্ভিসও আছে এদের।

মোটেলের সামনে দাঁড়ালে, তিন-চারশো গজ দূরে সৈকতে এদের নিজস্ব রংচঙে জেটি ও তাতে বাঁধা ডজনখানেক বোট চোখে পড়ে। মাঝারি সাইজের ইয়টও আছে ওর মধ্যে দুটো। আগে-পরে, আলাদা আলাদাভাবে মোটেলে উঠল ওরা। আগে থেকে ঠিক করা পরিকল্পনা অনুযায়ী ফয়েজ ও বিল্লাহ বাইরে থেকে খেয়ে এল প্রথমে। পরে বেরুল মাসুদ রানা ও নাদিরা। লাঞ্চ সেরে ট্যাক্সি নিয়ে মোটেলে ফিরে এল মেয়েটি, রানা গেল জুয়েলারি মার্কেট। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে পাথরগুলো খসিয়ে ফেলল ও। তারপর ফোন করল আরমান্দো সোকারাসের নাম্বারে।

'কাজ কতদূর?'

'কতদূর কি, বস্? সময়মতই কমপ্লিট হয়ে গেছে সব। আপনার ডাকের অপেক্ষায় বসে আছি।'

'কোথায় ওগুলো?'

'আমার সামনেই। টেবিলের ওপর।'

'ঠিক আছে। এখন শোনো, আগামীকাল সকাল দশটায় জ্যাকসনভিল আটলান্টিক বুলেভার্ড পৌঁছবে তুমি।'

'জ্যাকসনভিল, বস্!' ও প্রান্তে প্রায় গুঙিয়ে উঠল কিউবান। 'মাই গড! অতদূর যেতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, বস্...'

'কোন কিন্তু নেই, আরমান্দো। ওখানেই কাগজপত্র আমার হাতে তুলে দিচ্ছ তুমি। পরিষ্কার?'

কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে রাজি হয়ে গেল কিউবান। 'ঠিক আছে, বস্। আপনি যখন বলছেন, কি আর করা।'

‘গুড ।’

‘বাকি টাকা?’

‘আছে। ভয় নেই।’

‘ছি ছি! আমি তা বলিনি। আচ্ছা যাক, বাদ দিন। ওখানে কোথায় পাব আপনাকে?’

‘আটলান্টিক বুলেভার্ড থেকে শহরের দিকে যে রাস্তাটা এসেছে অরল্যাণ্ডের দিক থেকে, তার ঠিক মুখেই একটা ওপেন ফোন বুদ আছে। ওখানে থেকো। ঠিক সোয়া দশটায় ওটার নাম্বারে ফোন করব আমি।’

‘ফোন করবেন! শহরের ও মাথায়?’ বিস্ময় ফুটল আরমান্দোর কণ্ঠে। ‘আপনি থাকবেন না?’

‘আমি কোথায় থাকব, তখনই জানতে পাবে তুমি।’

চুপ করে থাকল লোকটা।

‘আরমান্দো!’

‘আমি শুনছি, বস্।’

‘যা বললাম, বুঝতে পেরেছ?’

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কিউবান। ‘বস্, এত সবের কি কোন প্রয়োজন ছিল? আশ্চর্য! আমার ওপর বিশ্বাস এতটাই চটে গেল আপনার?’

‘বোকার মত কথা বোলো না! প্রয়োজন আছে কি নেই সেটা ব্যাখ্যা করার সময় আসবে পরে। আর এ নিয়ে আবেগপ্রবণ হওয়ারও কিছু নেই। তুমি ভালই জানো আমার কাজের পদ্ধতি। আর যতক্ষণ না উল্টোটা প্রমাণ হয়, ততক্ষণ কারও ওপর থেকে বিশ্বাস হারাই না আমি। তাই যদি হত, কাজটা আমি তোমাকে দিতামই না। ও কাজ করে দেয়ার মত সোর্সের অভাব নেই আমার, সেটাও তুমি জানো।’

'হ্যাঁ। জানি।'

'তবু কেন আমি তোমাকে বেছে নিলাম, ভেবে দেখ। উত্তরটা নিজেই পেয়ে যাবে।'

আবার খানিক বিরতি। 'সরি, বস্। ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না কখনও।'

'ভেরি গুড। তাহলে ওই কথাই থাকল। ঠিক সোয়া দশটায়।'

'শিওর। ছবিগুলো আনতে ভুলবেন না, বস্।'

'না। ভুলব না। ওদের আর কোন খবর আছে?'

'মানে রবা...ইয়ে, ওদের? না, বস্। একদম সাড়া নেই। মনে হয় নেই ব্যাটারা এখানে। চলে গেছে বোধহয়।'

'সতর্ক থেকো পথে। ফেউ লাগে না যেন পিছনে।'

'ফেউ! আমার পিছনে? হাসালেন।'

'হাসালাম নাকি? তাহলে হেসে নাও খানিক। কিন্তু লক্ষ রেখো, পরে যেন কাঁদতে না হয় আবার।'

'ওকে, বস্। সতর্ক করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আপনিও গর্ত ছাড়ার আগে চারদিকটা দেখে নেবেন।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল মাসুদ রানা। ফিরে এল হোটেলে। আরমান্দোর টাকাটা আলাদা করে একটা রুমালে পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখল। তারপর খানিক গড়াগড়ি করে উঠে পড়ল। বেরিয়ে এসে লাউঞ্জে বসল নাদিরাকে নিয়ে। ফয়েজ আর বিল্লাহও এসেছে। ওদের থেকে খানিকটা তফাতে বসেছে তারা, যেন চেনে না। গল্প করতে করতে কফি খেলো ওরা।

পাটে বসতে চলেছে সূর্য। মেঘের দাপটের কাছে আজ সারাদিন এমনিতেই বেশ নিস্তেজ ছিল ওটা। মেঘ এখনও আছে

আকাশে, তবে ছেঁড়াফাটা। চলছে ধীর গতিতে, ড্রাগনের মত মোচড় খেতে খেতে। আলো-আঁধারীর চমৎকার খেলা চলছে সৈকতে। 'চলো, রানা, বীচে গিয়ে বসি।'

'চলো।' রুম থেকে বড় দুটো তোয়ালে নিয়ে এল মাসুদ রানা। ফয়েজ আর বিল্লাহর পাশ কাটিয়ে আসার সময় চাপা গলায় বলল, 'রুমের দিকে খেয়াল রেখো।'

হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা-নাদিরা। বালুকাবেলায় ভেঙে পড়ে গড়িয়ে এসে ওদের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে সাগরের ফেনিল পানি। নাকেমুখে আছড়ে পড়ছে সূক্ষ্ম পানির কণা। নীরবে দাঁড়িয়ে বাতাসের মৃদু গোঙানি শুনল ওরা। 'রানা!' দীর্ঘ সময় পর নীরবতা ভাঙল নাদিরা।

'বলো।'

'এ দেশে আর আসা হবে না আমার, তাই না?'

'কেন আসা হবে না?' চোখ কুঁচকে ওকে দেখল মাসুদ রানা।

'আমি ফিরে এলে রবার্টো...' থেমে গেল সে রানাকে মাথা নাড়তে দেখে।

'রবার্টো তখন থাকবে না,' দৃঢ়, নিশ্চিত কণ্ঠে বলল ও।

'বুঝলাম না।'

'বেশি বুঝে কাজ নেই। মোট কথা রবার্টো তখন থাকবে না। নিশ্চিন্তে ফিরে এসো তুমি।'

'উঁম্‌ম্‌! ভাবছি...আর লেখাপড়া করব না। ছেড়ে দেব।'

'কেন?'

'আর ইচ্ছে করে না। কি হবে পড়ে?'

চোখ বড় করে ভাবুকের মত মাথা দোলাল রানা। 'তাইতো! কি হবে পড়ে?'

'যাও।' হেসে উঠল নাদিরা। 'ঠাট্টা কোরো না। আমি

সিরিয়াসলি বলছি।'

'আমিও সিরিয়াসলি জানতে চাইছি, লেখাপড়া না করলে তোমাকে যে না খেয়ে থাকতে হবে না তা আমি জানি, কিন্তু করবেটা কি? সময় কাটাবে কি করে?'

'বিয়ে করে ফেলব।'

'বিয়ে?'

'হুঁম!'

'তা মন্দ নয়। আছে নাকি পছন্দের কেউ?'

'আছে,' মিটিমিটি হাসছে নাদিরা। 'দারুণ স্মার্ট, হ্যাণ্ডসাম ছেলেটা।'

'তাহলে তো ভালই। সেরে ফেল কাজটা।'

'কিন্তু একটা মুশকিল আছে।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা।

'আমি ছেলেটাকে ভালবাসলেও সে আমাকে বাসে কিনা জানি না।'

'একতরফা প্রেম?'

মুখ নামিয়ে জুতোর ডগা দিয়ে বালি খুঁড়তে লাগল নাদিরা। রানা দেখল, ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে তার। 'প্রথম প্রথম কয়েকদিন তাই মনে হয়েছে আমার,' নিচু কণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু...'

'কি?'

'কিন্তু পরশু আর কাল রাতে মনে হয়েছে বুঝি দু'তরফাই।'

আহাম্মকের মত তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। 'পরশু আর কা...' বিদ্যুৎপৃষ্টের মত চমকে উঠল ও। নিশ্চয়ই গত দু'রাতের ঘনিষ্ঠতার কথা বোঝাতে চাইছে নাদিরা। ব্যাপারটা এতই আচমকা শুরু হয়েছিল, যখন বুঝতে পেরেছে রানা, তখন দেরি

হয়ে গেছে, অন্তত প্রথম রাতে। আর সে জন্যে ওর চেয়ে নাদিরাই বেশি দায়ী। 'নাদিরা! মারাত্মক ভুল করছ তুমি!'

'কেন? আমি কি তোমার যোগ্য নই?'

করুণ এক টুকরো হাসি ফুটল রানার মুখে। 'উল্টো বুঝলে, আসলে আমিই তোমার যোগ্য নই। তুমি কেন, কোন মেয়েরই স্বামী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।'

'কেন নেই? কিসের অভাব তোমার?'

'বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার অভাব। এ কয়দিন তো সঙ্গে থেকে নিজের চোখেই দেখলে প্রতি মুহূর্তে কি ভাবে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হয় আমাকে। প্রতিবার আমরা জিতে গিয়েছি বলে এখনও বেঁচে আছি, নইলে বহু আগেই আমার লাশের বুকে পা রেখে গলা ছেড়ে হাসত রবার্টো গার্সিয়া। সারাক্ষণ এর মধ্যেই থাকতে হয় আমাকে, নাদিরা। আমি চাই না আমার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে কেউ নিজের ধ্বংস ডেকে আনুক। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, প্লীজ!'

'তার মানে আমারই ভুল! একতরফাই ছিল তাহলে ব্যাপারটা!'

'না, তোমার ভুল হয়নি। ভাল আমিও বাসি তোমাকে।'

'কি বললে?' অবাক চোখে তাকাল নাদিরা।

'ঠিকই বলেছি। হ্যাঁ, তোমাকে ভালবাসি আমি। ভালবাসি বলেই চাই না তুমি কোন অনিশ্চিত পথে পা বাড়াও। আর যাকে আমি ভালবাসি না, সে সেধে এলেও তাকে আমি গ্রহণ করি না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটি। মন খারাপ হয়ে গেছে। পরে অবশ্য একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠল। রানার দিকে চেয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'সত্যি?'

'কি?'

‘তুমি আমাকে সত্যি ভালবাস?’

হাসল মাসুদ রানা। ‘বিশ্বাস হলো না?’

বাচ্চা মেয়ের মত মাথা দোলাল নাদিরা। ‘হয়েছে। তবু আবার শুনতে ইচ্ছে করছে।’ ওর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে। ‘বলো না!’

‘শোনো মেয়ে, আমি তোমাকে ভালবাসি।’

‘আরেকবার,’ আবেগে চোখ বুজে এল নাদিরার। ‘প্লীজ!’

‘আমি তোমাকে ভালবাসি।’

চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল মেয়েটির। পাশাপাশি, গায়ে গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখল ওরা। দূর থেকে একটা জাহাজ চলে গেল কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। মাথার ওপর উড়ছে অনেকগুলো সী-গাল, রাতের মত আশ্রয়ের খোঁজে চলেছে ওরা। সৈকতও খালি হয়ে গেল একটু একটু করে, চলে গেছে সৌন্দর্য পিপাসুরা।

‘রানা!’

‘বলো।’

‘এভাবেই কাটবে জীবন? কোনদিন কি ঘর-সংসার করা হবে না তোমার?’

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল মাসুদ রানা। ‘সময়ে যা হয় না, তা কি অসময়ে হয় কখনও?’

‘ইচ্ছে করলেই তো সুযোগটা করে নিতে পারো।’

‘কি ভাবে?’

‘এই পেশা ছেড়ে দিয়ে।’

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। বিষণ্ন। ‘পারি না।’

‘কেন পারো না?’

পায়ের কাছে এসে পড়া ছোট একটা মরা ডাল লাথি মেরে

পানিতে ছুঁড়ে দিল ও। 'এ ছাড়া নিজেকে কল্পনাই করতে পারি না আমি। যদি কখনও এমন দিন আসে, ছেড়ে যেতে হবে আমাকে এ পেশা, তাহলে হয়তো...,' শিউরে উঠে থেমে গেল মাসুদ রানা। 'ভাবতেও পারি না। তারচে' মৃত্যুও অনেক ভাল।'

ওর বাহু আঁকড়ে ধরে, কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে থাকল নাদিরা। দিনের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

আটলান্টিক বুলেভার্ড জংশন। সকাল দশটা।

টকটকে লাল একটা প্যাকার্ডের ড্রাইভিং সীটে বসে আছে আরমান্দো সোকারাস। পাশের সীটে বসা আণ্ডারটেকার, ম্যানুয়েল গার্সিয়া। আজ আরও বেশি নার্ভাস লাগছে লোকটাকে। ঘামছে সে। ঢোঁক গিলছে ঘন ঘন। হাতের তালু ঘামছে বেশি। থেকে থেকে প্যান্টে হাত ঘষছে লোকটা।

অস্থির চিত্তে স্টিয়ারিং হুইলে তবলা বাজাচ্ছে আরমান্দো। বার বার তাকাচ্ছে ডানদিকের ওপেন বুদটার দিকে। তার পাঁচ হাতের মধ্যে রয়েছে বুদটা। গার্সিয়ার নড়াচড়ায় এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠল সে। 'একটু স্থির হয়ে থাকতে পারো না তুমি?' চোখ গরম করে লোকটার দিকে তাকাল আরমান্দো। 'এত কিসের ভয় তোমার? এমন ভীতু মানুষ বাপের জন্মে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি! যত্তোসব!'

মুখ খুলল না গার্সিয়া। এদিকে তাকালও না। তবে উসখুস খানিকটা কমল।

ঠিক সোয়া দশটায় বাজল ফোন। রিং কানে আসামাত্র সশব্দে দরজা খুলল আরমান্দো, ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল। 'হ্যালো!'

'আরমান্দো?'

'ইয়েস, বস্।' হাসি ফুটল কিউবানের মুখে।

‘কেনসিংটন রোডের নেভাডা হোটেলের কাছের ফোন বুদে এসো পনেরো মিনিটের মধ্যে। সাড়ে দশটায় ওখানে ফোন করব আবার।’

‘অল রাইট, বস্,’ একটু ইতস্তত করে বলল সে। ফোন রেখে গাড়িতে উঠেই স্টার্ট দিল, ছুটল কেনসিংটন রোড। শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে জায়গাটা। দশ মিনিট লাগবে পৌঁছতে।

আরমান্দো কিছুদূর এগিয়ে যেতে একটা ডজ এসে দাঁড়াল ওই পাবের সামনে। ফয়েজ নামল গাড়ি থেকে, একটা নাম্বারে ডায়াল করল। ‘ফয়েজ বলছি।’

‘বলো।’

‘সন্দেহজনক কিছু মনে হলো না ওর আচরণে।’

‘শিওর?’

‘জ্বি। সোজা এসে গাড়িতেই বসে ছিল আপনার ফোন আসা পর্যন্ত। তারপর কথা সেরেই রওনা হয়ে গেছে। কোথাও কোন ফোন করেনি, কাউকে কোন সঙ্কেতও দেয়নি। কেউ অনুসরণও করেনি ওকে।’

‘যাক,’ সন্তোষ প্রকাশ পেল মাসুদ রানার কণ্ঠে। ‘থার্ড পোস্টে চলে যাও তুমি।’

‘জ্বি।’ রিসিভার রেখে ডজে উঠল ফয়েজ আহমেদ। ছেড়ে দিল গাড়ি।’

শহরের আরেক প্রান্তে বেজে উঠল আরেকটা টেলিফোন। ‘সেনেয়র?’

‘হোমার পিকিং পরিষ্কার?’ অন্য প্রান্ত থেকে ইটালিয়ানে প্রশ্ন করল গম্ভীর একটা কণ্ঠ।

‘একদম পরিষ্কার, সেনেয়র।’

‘কোথায় আছে এখন ওরা?’

‘একেবারে আমার হাতের মুঠোয়।’

‘কীপ ওয়াচ। আমি ফোনের পাশেই আছি। ওদের লোকেশন বদল হলেই আমাকে জানাবে।’

‘নিশ্চই, সেনেয়র।’

‘আরমান্দো?’

‘হ্যাঁ, বস্।’

‘গ্র্যাণ্ড প্যালেস হোটেলের উল্টোদিকের পাবে এসো। পনেরো মিনিট পর যোগাযোগ করব আমি। পৌনে এগারোটায়।’

বেকুবের মত রিসিভারের দিকে চেয়ে থাকল কিউবান। লাইন কেটে গেছে। বিড়বিড় করতে করতে প্যাকার্ডে এসে উঠল সে। গাড়িটা সামনের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেতে কাটলাস থেকে বেরিয়ে এল মুত্তাকিম বিল্লাহ, রিসিভার তুলল। পাবের দশ গজ সামনের একটা পার্কিং লটে আগে থেকেই বসে ছিল সে, ভিউ মিররে চোখ রেখে পিছনটা দেখছিল।

‘একদম ক্লীন, কোন সন্দেহ নেই।’

‘ঠিক আছে। অপেক্ষা করো তুমি, আমরা আসছি।’

পাঁচ মিনিট পর একটা ট্যাক্সি এসে থামল দাঁড়িয়ে থাকা ওল্ডসমোবাইল কাটলাসের পিছনে। মাসুদ রানা ও নাদিরা নামল ওটা থেকে। ‘ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও জায়গামত,’ বিল্লাহর উদ্দেশে বলল রানা। পৌনে এগারোটায় শেষবার যোগাযোগ করল রানা কিউবানের সঙ্গে। হোটেল গোল্ডেন ভিউর অবস্থান ভাল করে বুঝিয়ে দিল তাকে। ‘সোজা চলে যাও। ওখানে পাবে তুমি আমাকে।’

ফোন রেখেই দ্রুত কাটলাস ছোটাল মাসুদ রানা। ওদের

থেকে প্রায় দশ মিনিট এগিয়ে আছে আরমান্দো এবং ফয়েজরা, ওভারটেক করতে হবে তাদের।

হাঁ করে কিছু সময় ধ্বংসস্তূপটার দিকে তাকিয়ে থাকল নাদিরা। একটা ঢোঁক গিলল। 'এ যে ভূতুড়ে বাড়ি!'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। গাড়ি ঘুরিয়ে গেটমুখো করে রাখল ও, স্টার্ট বন্ধ করল। তবে চাবিটা বের করল না ইগনিশন থেকে। দ্রুত কেটে পড়ার প্রয়োজন হতে পারে। নেমে এল ওরা গাড়ি থেকে। অবাক চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল মেয়েটি। পাখির ডাক, আর মৃদু বাতাসে গাছপালার দুলুনি ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই চারদিকে। গোল্ডেন ভিউর ভৌতিক কাঠামোর সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে পরিবেশটা।

ওদের আওয়াজ পেয়ে ফয়েই-এর ভাঙা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ফয়েজ, কিন্তু বাইরে এল না। ঘুরে বোটটা দেখে নিল রানা। আছে ওটা জায়গামতই।

'ওপরতলায় একটা স্যুইট পাওয়া যাবে না?' হাসি মুখে বলল নাদিরা। 'বারান্দাসহ লাক্সারি স্যুইট?'

'চলো, খুঁজে দেখা যাক।'

পোর্টিকো অতিক্রম করে ওপরে উঠে এল ওরা হাত ধরাধরি করে। বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল নাদিরা। নাক কুঁচকে উঠল তার। 'ইয়াল্লা!'

'ভেতরের অবস্থা আরও খারাপ,' বলল মাসুদ রানা। 'মুখ দিয়ে দম নাও।'

'থাক তাহলে। আর গিয়ে কাজ নেই।'

'বেশ।' এগিয়ে গেল মাসুদ রানা। ফয়েজের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলল কিছুক্ষণ। পাঁচ মিনিটও হয়নি, গাড়ির আওয়াজ শোনা

গেল। পিছিয়ে এল রানা, ফয়েজ চলে গেল আড়ালে। নাদিরাও শুনতে পেয়েছে শব্দটা। 'একটা গাড়ি, রানা।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। সামান্য সরে এসে সামনে দাঁড়াল। পরক্ষণে টকটকে লাল একটা প্যাকার্ড চোখে পড়ল ওর। হোটেল কম্পাউণ্ডের বাইরে রাস্তার ওপর থেমে পড়েছে গাড়িটা, এদিকে ফিরে উঁকিঝুঁকি মারছে আরমান্দো। সিঁড়ি ভেঙে ছাদহীন পোর্টিকোয় নেমে এল মাসুদ রানা, যাতে লোকটা দেখতে পায়। কিন্তু তার দরকার হলো না, আগেই ওর ওল্ডসমোবাইলটা দেখে ফেলেছে সে।

সাঁৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল আরমান্দো। রানাকে দেখামাত্র দাঁত বেরিয়ে পড়ল লোকটার, আনন্দে না স্বস্তিতে বোঝা গেল না। কাটলাসের মুখোমুখি দাঁড় করাতে যাচ্ছিল সে নিজের প্যাকার্ড, কিন্তু কি ভেবে শেষ মুহূর্তে সরে এল, পাশাপাশি থামল। লক্ষ করল রানা, গাড়িটা ঘোরাল না কিউবান। নেমে এল।

'হাই, বস্!' হাত নাড়ল উচ্ছ্বসিত আরমান্দো।

'হাই!'

'নেমে এসো,' পিছন ফিরে সঙ্গীর উদ্দেশে বলল কিউবান। ডানে তাকাতেই উঁচু বারান্দায় মিঙ্ক কোট পরা নাদিরার ওপর চোখ পড়তে একটু থমকাল। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল সে তাকে। মাসুদ রানার মুখোমুখি দাঁড়াল এসে। পাশে তাকিয়ে গার্সিয়াকে না দেখে খেপে গেল কিউবান। ঘুরে তাকিয়ে খ্যাক খ্যাক করে উঠল। 'এখনও এলে না? তোমাকে নামাতে স্ট্রেচার লাগবে নাকি?' রানার দিকে ফিরল সে। 'কী যে মুসিবতে পড়েছি একে নিয়ে! এমন ভীতু, টিকটিকির ডাক শুনেও লাফিয়ে ওঠে।'

নেমে পড়ল ম্যানুয়েল গার্সিয়া। সেদিনের মত একই

পোশাকে আছে লোকটা, হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। চেহারা তার আরও শোচনীয় লাগছে আজ। মুখটা চকের মত সাদা। কপালে চিকচিক করছে চিকন ঘাম। কাঁপা পায়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল সে। চোখ কাঁপছে ঘন ঘন।

ক্যাটকেটে গাঢ় সবুজ রঙের কমপ্লিট সুট পরেছে আজ আরমান্দো সোকারাস। টু-টোনড, ভোঁতা নাকের জুতো, মাথার দিক বাদামী, বাকিটা হলুদ চকচকে নরম চামড়ার। গায়ে জংলা ছাপার শার্ট, গলায় বিঘৎখানেক চওড়া প্রিন্টের টাই। মাথায় সম্ভবত পমেড মেখেছে লোকটা, রোদের আলোয় চিকচিক করছে চুল। দু'হাতেই দুটো করে হীরের আংটি। এত কড়া পারফিউম মেখেছে যে দম আটকে আসছে মাসুদ রানার।

কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। কি যেন একটা অসামঞ্জস্য চোখে পড়েছে রানার ম্যানুয়েল গার্সিয়ার মধ্যে, এতই সূক্ষ্ম যে ধরতে পারছে না। অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে ব্যাপারটা। সেটা যে কি, বের করার জন্যে ফুল স্পীডে মাথা ঘামিয়েও সুবিধে করতে পারল না মাসুদ রানা। লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকবার নজর বোলাল ও, কিন্তু লাভ হলো না। বিষয়টা ধরা গেল না।

অস্বস্তি লাগলেও ভাবনাটা আপাতত পাশে সরিয়ে রাখল মাসুদ রানা। কিউবানের দিকে ফিরল। 'তোমার গাড়ির বুট খোলো।'

বিস্মিত হলো লোকটা। 'কেন, বস্?'

আমল দিল না রানা। 'চেক করব।'

'ইশ্!' মাথা দোলাল লোকটা ঘন ঘন। 'ইজ্জত এতক্ষণে যেটুকুও বা ছিল, বস্, দিলেন পাংচার করে।'

বুট দেখল রানা, পিছনের সীটের ফ্লোরবোর্ডের ওপরও চোখ বোলাল একবার। 'বিজনেস ইজ বিজনেস।' নাদিরার দিকে

তাকাল রানা, আগের জায়গায়ই আছে সে।

'নাও,' গার্সিয়াকে বলল আরমান্দো। 'বের করো তোমার কাগজপত্র।'

কাঁপা হাতে ব্যাগের চেইন খুলল আণ্ডারটেকার, একগাদা কাগজ-কার্ড ইত্যাদি বের করল। কাঁপুনির চোটে একটা কার্ড হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল, চট করে তুলে ফেলল সে ওটা। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে একবার রানা, একবার আরমান্দোর দিকে তাকাল। তারপর সব কাগজ এগিয়ে দিল রানার দিকে। মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের করেনি লোকটা এ পর্যন্ত।

একটা একটা করে পরখ করল রানা সবগুলো। পাসপোর্টের প্রতিটি পাতা, সোশাল সিকিউরিটি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, বার্থ সার্টিফিকেট, একাধিকবার করে পরীক্ষা করল রানা সতর্ক চোখে। ঠিকই আছে সব, অন্তত কাস্টমসকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে এগুলো যথেষ্ট। হঠাৎ করেই হাত থেমে গেল মাসুদ রানার, মাথা তুলল ঝট্ করে।

'একটা শব্দ পেলাম যেন?' নাদিরার দিকে ফিরে বলল ও।

ভুরু কোঁচকাল মেয়েটি। দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল। 'কই! শুনিনি তো!'

'মনে হলো যেন পানির শব্দ,' বলে মাথা নামাল রানা। শেষবারের মত ওল্টাতে লাগল কাগজগুলো।

'ছবি এনেছেন, বস্?'

'এনেছি,' বলল রানা মাথা দুলিয়ে। গতরাতে ডিনার খেয়ে ফেরার পথে নাদিরার ছবি তুলিয়ে একবারে ওয়াশ করিয়ে নিয়ে মোটেলে ফিরেছিল ও।

'রানা!' সোজা হয়ে গেল নাদিরা।

মুখ তুলল মাসুদ রানা।

'আমিও শুনেছি একটা শব্দ! এইমাত্র!'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। মাথাটা একটু কাত করে দাঁড়িয়ে থাকল, কিছু শোনার চেষ্টা করছে। দুই ধাপ সিঁড়ি ভাঙল নাদিরা অস্থির চিত্তে, তারপর আরও দুই ধাপ। মুখের রং পাল্টে যেতে শুরু করেছে দ্রুত।

'ইঁদুর হবে হয়তো,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল আরমান্দো। 'অথবা কোন পাখি-টাখি। নয়তো আর কিসের আওয়াজ উঠবে এমন বাজপড়া জায়গায়?'

কেউ কোন কথা বলল না। জমে গেছে সবাই, শুধু গার্সিয়া বাদে। কাঁপুনি বেড়ে গেছে তার বহুগুণ। ঢোঁক গিলছে ঘন ঘন।

এই সময় আবার উঠল আওয়াজটা। পরিষ্কার শুনতে পেল সবাই। মনে হলো হাঁটতে গিয়ে কেউ যেন অসাবধানে পা দিয়ে ফেলেছে পানি ভরা নরম গর্তে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল নাদিরা, 'রানা!'

কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল মাসুদ রানা, মুহূর্তে ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে হাতে। কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'নাদিরা! ভেতরে যাও!' বলেই আরমান্দোকে লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল ও। 'বিশ্বাসঘাতক!'

সশব্দে আঁতকে উঠল কিউবান। চোখ দুটো লাফিয়ে পড়ার জোগাড় কোটর ছেড়ে। দু'হাত সামনে তুলে এক পা পিছিয়ে গেল সে। 'ঈশ্বরের কসম, বস্, আমি কিছু জানি না! আমি ট্রেইটর না! যিশুর কসম, বস্, আমার বউ-বাচ্চার কসম! আমি কিছু জানি না! আমি কিছু জানি না!' ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল লোকটা।

ডানদিকে কয়েক জোড়া ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ উঠল। সৈকতের দিকে। পলকে বুঝে ফেলল রানা কি ঘটে গেছে। প্রথম থেকেই ওর নজর ছিল রাস্তার দিকে, শত্রু যে সাগরপথে আসতে

পারে, ভাবেইনি। বরং রাস্তার দিক থেকে ধাওয়া এলে ওই পথে সরে পড়বে বলে একটা স্পীডবোট ভাড়া করেছে ও, সকালে ফয়েজ বেঁধে রেখে এসেছে বোটটা সৈকতে। অথচ, ওদিক থেকেই শত্রু এসে হাজির। ওদিকে মেয়েটির চিৎকার শুনে বুঝে গেছে গার্সিয়া, এখন আর লুকোছাপায় কাজ হবে না। টের পেয়ে গেছে ওরা। তাই কাদা-পানি মাড়িয়ে ছুটে আসছে সে দলবল নিয়ে।

'টাশ্‌শ্‌, টাশ্‌শ্‌!'

নাদিরার ডানদিকে পোর্টিকোর মোটা একটা থামে বিদ্ধ হলো গুলি দুটো। ভয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, চোখ কপালে তুলে প্রায় উড়ে পেরিয়ে এল বাকি ধাপগুলো। দিশা হারিয়ে ফেলেছে। ছুটে বেরিয়ে এল ফয়েজ ভেতর থেকে, বুঝে নিয়েছে আর লুকিয়ে থাকার সময় নেই। মাটিতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে আরমান্দো, কাঁপছে এখনও সে। ওদিকে হাতের ব্যাগ ফেলে আড়াল নেয়ার উদ্দেশে ছুটতে শুরু করেছে ম্যানুয়েল গার্সিয়া। চোখের কোণ দিয়ে রাস্তায় একটা নড়াচড়া দেখতে পেল রানা, বিল্লাহও পৌঁছে গেছে।

নাদিরার হাত ধরে বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল মাসুদ রানা। খোলা জায়গায় থাকলে বুলেট খেতে হবে যে কোন মুহূর্তে। 'ওখানে থাকলে মরবে,' ছুটতে ছুটতে আরমান্দোর উদ্দেশে বলল রানা। 'জলদি ভেতরে এসো!'

দৌড়ের ফাঁকে গার্সিয়ার দিকে এক পলক তাকাল রানা, আরমান্দোর গাড়ির আড়ালে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ব্যাঙের মত বসে আছে লোকটা। এক বিন্দু রক্তেরও আভাসও নেই মুখে। কেন যেন তাকে সতর্ক করার ইচ্ছে হলো না মাসুদ রানার। ফয়েই-এ পা রেখে অনেকটা নিরাপদ বোধ করল ও।

ভেতরে এসেই আশ্রয় নিল দরজার পাশে। কাঁধ ধরে চেপে মাটিতে বসে পড়তে বাধ্য করল নাদিরাকে।

ওদের পাশ ঘেঁষে প্রায় উড়ে ভেতরের দিকে ছুটে গেল আতঙ্কিত আরমান্দো। দূর থেকে করুণার চোখে লোকটাকে দেখল ফয়েজ এক পলক, তারপর একটা পাল্লাহীন জানালার পাশে অবস্থান নিয়ে বাইরে তাকাল। উঁকি দিল মাসুদ রানাও। সৈকতের দিকের ঝোপঝাড় ঠেলে হোটেল কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়েছে সাত-আটজন। দেখতে দেখতে কয়েকটা শ্রীহীন পাম গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল তাদের কয়েকজন। দু'জন থামল না, কুঁজো হয়ে ছুটছে তারা, কম্পাউণ্ড ঘুরে হোটেলের পিছনে পৌঁছতে চাইছে সম্ভবত। ওদের আগে আগে যে আরও দু'জন আছে, চোখেই পড়েনি কারও। টার্গেট দুটো খুব পছন্দ হলো ফয়েজের। ছুটন্ত টার্গেট শুইয়ে ফেলার মজাই আলাদা। তার সাব মেশিনগানের আচমকা ঠা ঠা হুঙ্কারে চমকে উঠল বিরান সোনালী সৈকত। মুখ থুবড়ে কাদামাটিতে আছড়ে পড়ল একটা টার্গেট, অন্যটা বিকট এক চিৎকার ছেড়েই বসে পড়ল, পর পর দুটো বুলেটের আঘাতে তার ঊরুর হাড় পাউডার হয়ে গেছে। তার সামনেই সঙ্গীর নিশ্চল দেহ পড়ে আছে। ওদিকে গার্সিয়া সহ দলের অন্যরা মেশিনগানের আওয়াজে হতভম্ব হয়ে পড়েছে, অভ্যর্থনা জানাতে মাসুদ রানা যে এই মাল সঙ্গে নিয়ে এসেছে, এ ছিল ওদের কল্পনার বাইরে। ক্ষণিকের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল সে।

ওদিকে খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে বিল্লাহর। ও যে ছুটে এসে হোটেলের গেটের কাছে এক ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে, লক্ষই করেনি কেউ। দুটোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে নিজের অবস্থান থেকে। পিস্তল উঁচিয়ে বসে আছে মূর্তির মত,

গাছের পিছনে, নজর সামনে। গলা বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না। দূরেরটা একটু কঠিন, তাই ওটাকেই প্রথম পছন্দ করল বিল্লাহ। কাছেরটাকে পরেও নেয়া যাবে। ওর সরার উপায় নেই, কিন্তু দূরেরটা বিপদ কোন দিক থেকে আসছে টের পেয়ে যদি কয়েক ইঞ্চিও সরে বসে, তাহলে ওকে ঝোলায় পোরা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে।

এসএমজি রেখে নিজের ভয়ঙ্করদর্শন লুগার তুলে নিল বিল্লাহ, সতর্কতার সাথে, প্রথম পছন্দের ডান কানের ওপরের খুলি তাক করল। বিকট 'টাশ্‌শ্‌!' শব্দে তপ্ত মৃত্যুবর্ষণ করল তার পিস্তল, হেভি ক্যালিবার বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কায় শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো লোকটা। চুলসমেত এপাশের খুলির বড় একটা অংশ আকাশে উঠে পড়তে দেখা গেল তার, বাতাসে কয়েকটা এলোপাতাড়ি পাক খেয়ে ভেতরের রক্তাক্ত পেট মেলে দিয়ে চিত হয়ে পড়ল সেটা। কিসের আঘাতে মৃত্যু হলো, টেরও পায়নি সম্ভবত লোকটা।

তাই দেখে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল এ পাশের লোকটির। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত তাকিয়ে থাকল সে কয়েক গজ দূরে পড়ে থাকা দেহটার দিকে। চেহারা হয়েছে বেকুবের মত। এক মুহূর্ত, তারপরই ঝট্‌ করে এদিকে ফিরল সে, বুঝতে পেরেছে কোন দিক থেকে এসেছে বুলেটটা। বিল্লাহর লুকিয়ে থাকা অবস্থানের দিকে অস্ত্র তুলল সে দ্রুত, কিন্তু ভঙ্গি অনিশ্চিত। গুলি করবে কি করবে না, ভাবছে। ঠিক এই সময় কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হলো লোকটার। পিছন দিকে ভীষণ এক ঝাঁকি খেলো তার মাথা, এতই জোরে যে ঘাড়ের হাড় ফোটার মট্‌ মট্‌ আওয়াজও পরিষ্কার শুনতে পেল বিল্লাহ। বিস্ফারিত তিন চোখে আকাশ দেখতে দেখতে চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা।

মুহূর্তকয়েক হাত-পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল ।

‘ইয়াহু!’ উল্লাসে চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ফয়েজ। ‘আরও দুটো খরচ হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই । নিশ্চই লম্বা আহাম্মক, তোবা, বিল্লাহ নিয়েছে ওদের ।’

টাশ্‌শ্‌! টাশ্‌শ্‌!

পর পর দুটো গুলি, তারপরই একটা কাতর, চাপা আর্ত চিৎকারে চমকে উঠল মাসুদ রানা। গলাটা চিনতে পেরেছে ও, বিল্লাহর গলা। দ্বিতীয়জনকে গুলি করার সুবিধের জন্যে ঝোপের আড়াল থেকে ডান কাঁধ বের করতে হয়েছিল ওকে, কাজ সেরে আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার আগেই গুলি খেয়েছে সে। ঠিক কাঁধে লেগেছে গুলিটা। তার অবস্থান থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনে তাকাল মাসুদ রানা। মুহূর্তের জন্যে একটা ছায়া দেখতে পেল। এক গাছের আড়াল থেকে আরেক গাছের আড়ালে চলে গেল সেটা বাঁদরের মত লাফ দিয়ে ।

‘বিল্লাহ গুলি খেয়েছে!’ বলল রানা। রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। পিস্তলটা কোমরে গুঁজল ও, পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা মেশিন পিস্তল তুলে পিছনদিকে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। ওপাশে দেয়ালঘেঁষে বসে থাকা আরমান্দো বলে উঠল, ‘আমাকে একটা কিছু দিন, বস্‌ । যে কোন একটা অস্ত্র দিন ।’

তার দিকে তাকাল রানা। এখন আর আগের মত ভীত সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে না কিউবানকে। বরং মনে হচ্ছে কার ওপর যেন সাঙ্ঘাতিক রেগে আছে। মুহূর্তখানেক ভাবল ও, তারপর হাতের মেশিন পিস্তলটা দোলাল। ‘এটা চালাতে জানো?’

উঠে এল আরমান্দো। অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল। ‘চালাইনি কখনও, তবে জানি। দেখেছি কি ভাবে চালাতে হয় ।’

খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিল মাসুদ রানা।

‘বেশিক্ষণ ট্রিগার চেপে রাখবে না। গুলি করার সময় ব্যারেলটা ডানে বাঁয়ে এক ইঞ্চি ঘোরাবে। ওকে?’

‘ওকে, বস্,’ দৃঢ় আস্থার সুরে বলল আরমান্দো।

‘এখানেই থেকো। ফয়েজ, খেয়াল রেখো।’ আরেকটা মেশিন পিস্তল তুলে নিয়ে আবার পা বাড়াল ও।

‘কোথায় যাচ্ছ?’ জানতে চাইল নাদিরা।

‘আসছি। তুমি নড়বে না জায়গা থেকে।’ ফয়েই থেকে বেরিয়ে এল রানা। কাদার মত জমে থাকা প্যাচপেচে নোংরার ওপর দিয়ে যথাসম্ভব নিঃশব্দে ছুটল। দূর থেকে কম্পাউণ্ড ঘুরে সামনের দিকে যেতে চায় ও। বিল্লাহর খোঁজ নেয়া জরুরী। ভেতরে আবার গর্জে উঠল ফয়েজের এসএমজি। লম্বা এক করিডর পড়ল সামনে, সেটা ধরে দশ পা মত এগোল মাসুদ রানা, তারপর জমে গেল। চাপা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ও, সামনে থেকে আসছে কেউ। সাঁৎ করে দেয়ালের সাথে মিশে নেই হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা। হাতে উদ্যত মেশিন পিস্তল। প্রস্তুত। গার্সিয়া? ভাবল ও। কোথাও যে আড়াল নেবে, সে উপায় নেই। দু’পাশেই টানা দেয়াল।

মনে মনে পাঁচ পর্যন্ত গুণল মাসুদ রানা, ছয় গোণার সময় পেল না। তার আগেই বাঁকের মুখে বেরিয়ে এল রবার্টো গার্সিয়া। হাতে পিস্তল, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ধরা। নল সিলিঙের দিকে। ঠিক পিছনেই আরও একজন রয়েছে। ঘুরে এদিকেই আসতে যাচ্ছিল গার্সিয়া, সামনে চোখ পড়তে থমকে গেল। এ নিশ্চয়ই দলের সাথে ছিল না, ভাবল ও। থাকলে চোখ এড়িয়ে এতদূর আসতে পারত না কিছুতেই। হয়তো আগে থেকেই…সন্দেহটা আবার উঁকি দিল রানার মনে।

‘হ্যালো, গার্সিয়া!’ অমায়িক হাসি দিল রানা। ‘কেমন আছ?’

আহত বাঘের মত লাফ দিল লোকটা। জবাবে বিশ্রী ক্যাট ক্যাট শব্দে হুঙ্কার ছাড়ল রানার জার্মান মেশিন পিস্তল। ব্যাপার বুঝে ওঠার আগেই গার্সিয়ার ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল তার সঙ্গী, অবশ্য তার আগেই হালিখানেক গুলি হজম করতে হয়েছে লোকটাকে। লাফ দিয়েই চোখের আড়ালে চলে গেল গার্সিয়া। পা বাড়াতে গেল রানা ঝোঁকের মাথায়, থেমে গেল শেষ পর্যন্ত। টিপে টিপে এগোল। কোন সাড়া নেই ওপাশে।

ওদিকে ফয়েই থেকে একযোগে দুটো আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ ভেসে এল, পরমুহূর্তে কেঁপে উঠল হোটেল গোল্ডেন ভিউ বিস্ফোরণের ধাক্কায়। গ্রেনেড চার্জ করেছে ফয়েজ বা বিল্লাহ। বিল্লাহর অবস্থা কি, ভাবল রানা, পরক্ষণে চিন্তাটা বিদায় করে দিল। পরে দেখা যাবে, আগে গার্সিয়াকে চাই। বাঁকের মুখে এসে থেমে পড়ল ও, বসে উঁকি দিল। নেই কেউ। সামনে ফাঁকা। এটা আরেক করিডর।

পরক্ষণেই চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। মেঝেতে মোটা একটা রক্তের ধারা। পালাবার সময় পিছনে রেখে গেছে গার্সিয়া। আহত হয়েছে লোকটা মারাত্মকভাবে। ভেতরে ভেতরে নিঃশব্দ উল্লাস অনুভব করল ও। পায়ের কাছে পড়ে থাকা দেহটার ওপর চোখ বোলাল, বাঁকাচোরা হয়ে পড়ে আছে, নিঃশ্বাস পড়ছে কি না বোঝা দায়। পাশে পড়ে থাকা তার পিস্তলটা তুলে পকেটে ভরল মাসুদ রানা, তারপর রক্তের ধারা অনুসরণ করে এগোল। হাতের মেশিন পিস্তল পূর্ণ প্রস্তুত।

করিডরের শেষ মাথায় তিন ধাপ সিঁড়ি, তারপরই খোলা, কর্দমাক্ত প্রান্তর। চোখ তুলতেই ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে গার্সিয়ার ওপর চোখ পড়ল ওর। শ'খানেক গজ দূরে, উন্মুক্ত সৈকতের দিকে প্রাণপণে ছুটছে লোকটা ডান পা টেনে টেনে। এগোবার

ভঙ্গি দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না ভালই জখম হয়েছে সে। এক লাফে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। যে গাছগুলোর আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল গার্সিয়ার লোকেরা, সেদিকে থেমে থেমে দুই-তিন পশলা গুলি বর্ষণ করল। কোন জবাব এল না। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরেই তীরবেগে ছুটল সে গার্সিয়ার দিকে। এরমধ্যেই অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে লোকটা। আহত হলেও প্রাণের দায়ে ছুটছে, কাজেই পায়ের যন্ত্রণা এখন তুচ্ছ তার কাছে। আর এক-দেড়শো গজ যেতে পারলেই নিজের বোটে পৌঁছে যেতে পারবে গার্সিয়া।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ছুটছে মাসুদ রানা। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না। কাদাপানি বড় একটা বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রায়ই পানিভরা গর্তে পা ঢুকে যাচ্ছে, আছড়ে পড়ার অবস্থা হচ্ছে ওর। পিছনে হৈ-হৈ শব্দে না থেমে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। দীর্ঘদেহী এক যুবক ছুটে আসছিল ওর দিকে, কোণাকুণি। হোটেলের সীমানা দেয়ালের কাছে পাম গাছের সারির এপাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা ফয়েজ আর আরমান্দো দেখে ফেলেছে। চেঁচিয়ে সতর্ক করছে তারা রানাকে।

অবশ্য ওকে কিছু করতে হলো না। চেঁচিয়ে উঠেই গুলি করেছে ফয়েজ, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়েছে যুবক। ওদের খোলা জায়গায় দেখে নিশ্চিন্ত হলো রানা, তার মানে ওদিক ফর্সা হয়ে গেছে। সামনে নজর দিল ও, 'ছপাৎ', 'ছপাৎ', 'প্যাঁচ', 'প্যাঁচ' ইত্যাদি নানান আওয়াজ তুলে ছুটছে রবার্টো।

মাত্র দু'মিনিটে শেষ হয়ে গেল অসম দৌড় প্রতিযোগিতা। তখনও একশো গজ-মত পথ বাকি নিজের বোটে পৌঁছতে, কোনদিনই তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়াল অসহায় রাগে ক্ষিপ্ত, ঘর্মাক্ত রবার্টো গার্সিয়া। সাথে সাথে রানাও ব্রেক কষল। দু'জনের মাঝে পনেরো বিশ গজ ব্যবধান।

‘তোমার দৌড় শেষ, বুঝতে পারছ, গার্সিয়া?’ হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল রানা। মেশিন পিস্তল ধরে আছে লোকটার বুক সোজা।

উত্তর দিল না সে। জ্বলন্ত চোখে দেখছে ওকে। ব্যারেলের মত বুক প্রচণ্ড পরিশ্রমে ফুলে ফুলে উঠছে তার। ডান পায়ের কাছে রক্ত জমে জমে পুকুর হচ্ছে। প্যান্ট রক্তে ভিজে লেপটে আছে গায়ের সাথে। হাঁটুর সামান্য ওপরে লেগেছে গুলি। কয়টা কে জানে! পিছনে কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে আসছে। নাদিরার গলা শুনতে পেল রানা।

‘মৃত্যুর আগে কেন কি ঘটেছে তোমার জানা প্রয়োজন, গার্সিয়া,’ নরম গলায় বলল মাসুদ রানা। ‘না কি জেনে গেছ তুমি?’

উত্তর নেই। ধক্ ধক্ করে জ্বলছে লোকটার দু’চোখ। পিস্তল ধরা হাত অসহায়ের মত ঝুলছে। তোলার সুযোগ হয়নি। রানার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। বিল্লাহও আছে দলে। শার্টের একটা হাতা নেই তার, ওটা দিয়ে বাঁধা আছে তার গুলি বিদ্ধ ডান বাহু।

‘নিজের সমস্ত সম্পদ কেউ ছিনিয়ে নিলে কেমন লাগে, গার্সিয়া?’ হাসল রানা। ‘অনুমান করতে পারো? তোমার মত ডাকাতি করা নয়, কষ্ট করে অর্জিত সমস্ত ধনসম্পদ?’

কাঁপতে কাঁপতে নিজের রক্তের পুকুরে বসে পড়ল গার্সিয়া। কাঁপুনিটা ভয়ের, না ক্লান্তির বোঝা গেল না।

‘একে তো তুমি চেনোই,’ নাদিরাকে দেখাল ও। ‘আসল পরিচয় কি জানো এর?’ কেবল সামান্য বিস্ময় ফুটল লোকটার চোখে। এবং প্রশ্ন।

‘শেখ জাবের আল উবায়েদের নাতনি। মনে পড়ে শেখ জাবের নামটা? এবার বুঝেছ নিশ্চই, কেন এসব ঘটেছে?’

চরম বিস্ময়ে একটু একটু করে হাঁ হয়ে গেল রবার্টো। নাদিরাকে দেখতে লাগল অবাক চোখে। এ সময় এমন চমক হয়তো আশা করেনি। কিছুটা বিরতি দিল রানা। 'আর আমাকেও নিশ্চই চিনে ফেলেছ এতক্ষণে?' অনির্দিষ্ট ইঙ্গিতে সাগর-আকাশ নির্দেশ করল ও। 'প্রকৃতি তোমাকে বিদায় জানাচ্ছে, গার্সিয়া। তোমার মত নরকের কীটের উপযুক্ত নয় এ স্থান। অতএব...'

'না!' রানাকে অস্ত্র তুলতে দেখে আঁতকে উঠল গার্সিয়া। চোখ বিস্ফারিত। 'আমি...দুঃখিত! ক্ষমাপ্রার্থী! আমাকে...'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'লজ্জা দিয়ো না। ক্ষমার থলেটা সাথে আনিনি, কোথায় যেন ফেলে এসেছি মনের ভুলে। জাহান্নামে যাও তুমি, রবার্টো গার্সিয়া।'

ট্রিগারে তর্জনি চেপে বসল মাসুদ রানার। চার-পাঁচটা গুলি বেরিয়ে গেল মুহূর্তে। সবগুলোই প্রশস্ত বুক পেতে গ্রহণ করল গার্সিয়া। কাদার ওপর দিয়ে পিছলে কয়েক ফুট পিছিয়ে গেল সে, তারপর শুয়ে পড়ল পিঠ দিয়ে। চোখ খোলা। বাহুর ওপর হাতের চাপ অনুভব করে ঘুরে তাকাল রানা। নাদিরা খামচে ধরে আছে ওর হাত। দুচোখ বিস্ফারিত।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। বিল্লাহকে দেখল। 'জখম কেমন তোমার?'

'ও কিছু না, মাসুদ ভাই,' হাসল দানব। 'একটা বুলেট লেগেছে কেবল।'

'বুলেট?'

'বের করে ফেলেছে ফয়েজ।'

'গুড। আরমান্দো!'

'জ্বি, বস্?'

'তোমার আণ্ডারটেকার কোথায়?'

হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা। 'জ্বি?'

'ম্যানুয়েল গার্সিয়া?'

'ও-ও তো ওখানে,' হাত তুলে গোল্ডেন ভিউ দেখাল সে।

'চলো,' ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

ফয়েজ ইতস্তত করতে লাগল। 'এটার কি হবে, মাসুদ ভাই?' লাশটা দেখাল সে।

'টেনে সাগরে নিয়ে ফেলে দাও।'

ফয়েজ আর বিল্লাহ বাদে ওরা তিনজন ফিরে এল হোটেলে। খামটা কুড়িয়ে নিয়ে আরমান্দোর গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঢ্যাঙা লোকটা। মুখের ঘাম মুছছে ঘন ঘন। এখনও কাঁপছে একটু একটু। সোজা সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল তার চোখের দিকে।

ওর চাউনি সইতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিল লোকটা। চট করে হাত বাড়াল রানা, তার কোটের একটা বোতাম টান মেরে ছিঁড়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। অবাক চোখে ওর কাজ দেখছে নাদিরা–আরমান্দো। 'হুম!' বলল রানা। 'তাহলে তুমি?'

'কি হয়েছে, বস্?' তড়পে উঠল আরমান্দো। ঘন ঘন ওদের দু'জনের দিকে তাকাচ্ছে সে।

বোতামটা দেখাল রানা। 'এই লোকই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে গার্সিয়াকে। এর কোটে হোমার প্ল্যান্ট করেছিল লোকটা।' পায়ের নিচে ফেলে বোতামটা ভেঙে ফেলল ও এক চাপে। ভেতর থেকে চকচকে কি যেন বেরিয়ে পড়ল। 'আগেই সন্দেহ হয়েছে আমার কোথাও কোন গণ্ডগোল ঘটে গেছে। কিন্তু ধরতে পারিনি তখন। এখন বুঝলে তো, কেন এত সতর্ক...'

কথা শেষ করতে পারল না রানা, বাঘের মত ঢ্যাঙার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আরমান্দো সোকারাস। 'শালা বেঈমানের বাচ্চা!'

মনের সুখে লোকটাকে ধোলাই করল সে কিছুক্ষণ। এলোপাতাড়ি মেশিন পিস্তলের আঘাত, কিল, চড়, লাথি, ঘুসি বৃষ্টি করে শ্রান্ত হয়ে পড়ল নিজেই। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে তখন রক্তাক্ত ম্যানুয়েল গার্সিয়া। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল আরমান্দো। কাদা পানি মেখে ভূত। তারপর, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গর্জে উঠল তার মেশিনগান। বুক ঝাঁঝরা করে দিল সে আণ্ডারটেকারের।

'আমি দুঃখিত, বস্। আমারই জন্যে...'

'বুঝতে পেরেছ বলে ধন্যবাদ, আরমান্দো। ভবিষ্যতে আজকের কথা মনে রেখো।'

'নিশ্চই! আর কখনও...'

এবারও বাধা পেল সে। ছুটে এসে হাজির বিল্লাহ-ফয়েজ। 'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল ফয়েজ। 'গুলি কিসের?' পরক্ষণেই আরমান্দোর গাড়ির আড়ালে পড়ে থাকা মৃতদেহটা চোখে পড়ল। 'এ কি!' পালা করে উপস্থিত তিনজনকে দেখল ওরা।

তখনই কেউ কোন জবাব দিল না।

* * *

মাসুদ রানা

মৃত্যুর প্রতিনিধি

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিপদে পড়ে গেছে মাসুদ রানা, লুণ্ঠিত সামগ্রী নিরাপদে সরিয়ে ফেলার যে আয়োজন করেছিল ও, কেঁচে গেছে তা। ওগুলো এবং নিজেদের প্রাণ মুঠোয় নিয়ে পালাতে হচ্ছে রানাকে রবার্টোর তাড়া খেয়ে। রবার্টোর ফাঁদ ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে এল রানা একাধিকবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শত্রুর ঘেরাওর মধ্যে পড়তেই হলো ওদের।

জ্যাকসনভিলের এক সাগর সৈকতে মুখোমুখি হলো মাসুদ রানা ও রবার্টো গার্সিয়া।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০